এই গল্পটা হাসির

আনিসুল হক

ভুলে ভরা ছিল কল্লোলের সেই দিন। টুথপেস্ট মনে করে শেভিং ক্রিম দিয়ে দাঁত মাজা থেকে শুরু করে বিচিত্র ধরনের ও হাস্যকর রকমের ভুল একটার পর একটা করতে থাকে কল্লোল। সেই ভুল থেকেই শুরু হয় তার জীবনের এক নতুন উত্থান পর্ব। সাফল্য আসে জীবনে, আসে ভালোবাসাও।

এই গল্পটা হাসির

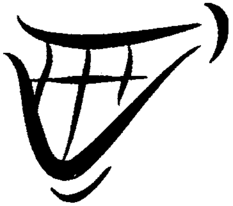

এই গল্পটা হাসির

আনিসুল হক

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
ananyadhaka@gmail.com

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
পদ্য পারমিতা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
৬১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম
একশত টাকা

ISBN 984 70105 0315 9

Ei Golpati Hasir by Anisul Hoque
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published February 2010, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 100.00 Taka Only

U.K Distributor, **Sangeeta Limited**, 22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor, **Muktadhara** 37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Hights, N.Y. 11372
Canada Distributor, **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202
Canada Distributor, **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave., Toronto

উৎসর্গ

কাব্যকে

৫১বর্তী ধারাবাহিকের কাব্য হিসেবে আপনারা যাকে চেনেন

ভূমিকা

একটা হাসির গল্পই লেখার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে। সেটা অপচেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে কিনা পাঠক বলতে পারবেন। এই বই যে বিমর্ষ বুদ্ধিজীবীদের জন্যে নয়, তা বলে রাখা দরকার। তবে কিশোর, তরুণ ও চিরতরুণদের এই বই ভালো লাগতেও পারে। একজনেরও যদি ভালো লাগে, তাহলেই শ্রম সার্থক মনে করব। সবার মঙ্গল কামনা করি।

আনিসুল হক

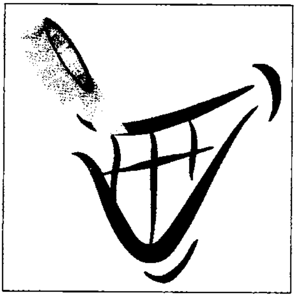

'এই গল্পটা হাসির', কল্লোল বলল।

কল্লোলের ওপরের পাটির বাঁ দিকে একটা দাঁত আরেকটা দাঁতের ওপরে তোলা। হাসলে তাকে সুন্দরই লাগে। অনেকটা কুমার বিশ্বজিতের মতো।

সীমা বলল, 'হাসির গল্প। তাহলে তো শুনতেই হয়।' সীমা গল্প শুরুর আগেই হাসিতে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ছিপছিপে গড়নের তন্বী তরুণীটি। তীক্ষ্ণ নাক, ভাসা ভাসা চোখ। গায়ের রংটা চাপা ফুলের মতো, একটু শ্যামলা হলেও এক ধরনের উজ্জ্বলতা ধরে। মেয়েটা লম্বাও হয়েছে লাউ ডগার মতো। লকলক করছে, শ্যামলিমায়, সতেজতায়।

'সীমা।'

'উঁ'?

'তোমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছি, জানো তো?'

'কীভাবে জানব? তুমি কি আমাকে বলেছ?'

'না বলি নাই। বলব বলে ডেকেছি।'

'বলো।'

'আসলে তোমাকে আমি এখানে ডেকেছি ওই হাসির গল্পটা বলতে।'

'আর আমিও তোমার হাসির গল্প শোনার জন্যেই কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম করে বাসা থেকে বের হয়ে এসেছি। না হলে কলেজের ইউনিফরম না পরে শাড়ি পরে সকাল সকাল বাসা থেকে বের হতে দেয়! বলো না, বাবা। বলে ফেলো তোমার গল্পটা।'

'গল্পটার মধ্যে অনেক হাসির ব্যাপার স্যাপার আছে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে একটা স্বীকারোক্তিও আছে। সেই কথাটা তোমাকে বলব কি বলব না ভাবছি।'

'কী কথা?'

'সেকথা তুমি শুনলে আমাকে আর বিয়ে নাও করতে পারো।'

'কল্লোল। তোমাকে কি আমি কখনও বলেছি যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই?'

'বলো নাই নাকি? আমার কিন্তু এই রকম একটা ধারণা হয়েছিল। আচ্ছা বাদ। এই ধারণাটা ভুল হয়ে থাকলে তাহলে আর কথা বাড়াতে চাই না। চলো চলো সীমা। ফিরে চলো।'

'আরে জায়গাটা তো সুন্দর। সামনে সমুদ্রের মতো পানি।'

'সমুদ্রের মতো পানি বলাটা ঠিক হলো না সীমা। সমুদ্রের পানিতে সাদা সাদা ঢেউ থাকে। সৈকতে সেই ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ে। এই পানিতে কোনো ঢেউ নাই। যা আছে তা ঢেউয়ের নামে কলঙ্ক! তবে ওই যে আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটা সমুদ্রের চেয়েও সুন্দর।'

'এই কল্লোল, আশুলিয়া এখান থেকে কতদূর।'

'ওই তো দেখা যাচ্ছে, সীমা।'

'আচ্ছা কল্লোল সাহেব বলেন। কী বলতে চাচ্ছেন? কেন আমাকে এইখানে ডেকেছেন?'

'তোমাকে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। তুমি যে এত সুন্দর করে শাড়ি পরতে পারো আমার কোনো ধারণাই ছিল না।'

'সুন্দর হয়েছে শাড়ি পরাটা?'

'হুঁ। হয়েছে। তোমাকে বউ বউ দেখাচ্ছে।'

'শাড়িটা সুন্দর না?'

'হুঁ। জোশ শাড়ি। রংটাও সুন্দর। এইটাকে কী রং বলে?'

'চকোলেট।'

'চকোলেট তো একটা খাবারের নাম। রংটার নাম বলো।'

'তোমার শার্টটার রং কী?'

'বেগুনি?'

'বেগুনিও তো একটা খাবারের নাম। তাহলে?'

'হা হা। কাটাকুটি। আচ্ছা এবার তোমাকে বলি। তোমাকে কেন এইখানে এই জায়গায় ডেকে আনলাম।'

'বলো, কেন?'

'শুনলে তো তুমি সোজা আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবা।'

'কী এমন কথা? গ্রামে তোমার আগে একটা বউ ছিল?'

'না তা না। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ।'

'তার চেয়েও খারাপ? তার মানে কী, বউ ছিল না, আছে। একটা না। গোটা দুয়েক?'

'আসলে তুমি আমাকে একজন মস্ত বীর হিসাবে জানো, দেশের মানুষ আমাকে একটা মাস্তানদের চেয়েও বড় মাস্তান হিসাবে জানে। সেসব আসলে ঠিক নয়।'

'কী বলো! এত বড় পুরস্কার দিলেন তোমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এত তোমার ইন্টারভিউ প্রচার করল টেলিভিশন চ্যানেলগুলো! পেপারে পেপারে তোমার ছবি। সবই কি মিথ্যা?'

'না। সেইসব মিথ্যা না।'

'তুমি টপ টেররটাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দাওনি?'

'দিয়েছি।'

'তাহলে সেসব ঠিক নয় বলছ কেন?'

'এই সীমা, তোমার চুলে এটা কী পড়েছে? হায় হায় এটা তো প্রজাপতি। প্রজাপতি গায়ে পড়া মানে তো বিয়ে হওয়া। তোমার বিয়ে হবে। কিন্তু আমার বিয়ে হবে না। লক্ষণ তো ভালো মনে হচ্ছে না।'

'প্রজাপতিটাকে ধরে তোমার গায়ে বসিয়ে দাও, চঞ্চল।'

'তার মানে আমাকে বিয়ে তুমি করতে চাও?'

'আমি চাই কে বলল? তুমি তো চাইছ। হায় হায় করছ। একা একা বকবক করছ। তুমি বলছ, একটা কথা বলবা। আবার তুমিই বলছ সেই কথাটা বললে তোমাকে আর আমি বিয়েই করব না। তাহলে আর বলার দরকারটা কী! তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকো। আমার গা ঘেষে বসো। দেখো, আকাশে মেঘগুলো কী সুন্দর। আর আকাশটা কত নীল। শরৎকালটা এই জন্যে আমার এত পছন্দ। ঢাকার আকাশ নীল হয় খুব কম। আজকে নীলটা একদম এক নম্বর। মেঘগুলোও কেমন সাদা সাদা। সুন্দর না।'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। আর তোমার পারফিউমটাও সুন্দর। খুব সুন্দর গন্ধ।'

'এই আমার আঁচলের ওপরে বসে পড়ছ। সরো সরো। ইস, আঁচলটাতে মাটি লেগে গেল।'

'আমার প্যান্টটা তো বাঁচল।'

'না, তোমাকে বিয়ে করা যাবে না। শাড়ির চেয়ে যে প্যান্টের মায়া বেশি করে তার সাথে আমি নাই।'

'আগে শোনো আমার বৃত্তান্ত। তারপর একেবারেই আমাকে বিদায় দাও।'

'খালি শোনো শোনো করছ। বলে ফেলো না। এই কীভাবে ছুঁড়লে ঢিলটা? কেমন করে পানির ওপরে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে গেল।'

'হা হা হা। এইটা আমাদের ছোটবেলার খেলা। কত খেলেছি। তবে সেদিন একটা পেপারে পড়লাম, এইটাকে নাকি বলে ছিনিমিনি খেলা।'

'তাই নাকি? এইভাবে পানির ওপরে ঢিল মারাটাকে। ভালোই তো বাংলা জানো।'

'বাগধারা। আচ্ছা তোমাকে তাহলে বিস্তারিত ভাবে বলি।'

'বলেন না সাহেব। বলে ফেললেই তো হয়। আমার জীবন নিয়ে এইভাবে আর ছিনিমিনি খেলবেন না।'

'আসলে সব কিছু ঘটছিল ভুল থেকে। মিসটেক আর এরোর থেকে। এইটা আসলে কমেডি অফ এররস।'

'কিছুই বুঝছি না। '

'স্যার। মালা কিইনা স্যার আপারে দেন, তাইলে আপা সব বুঝব।'

একটা আট/দশ বছর বয়সী একট ফুল বিক্রেতা মেয়ে আসে। তার হাতে মালা। গায়ে একটা ফ্রক। খালি পা। যে সব যুগল এই জায়গাটায় আসে, তাদের কাছে সে মালা বিক্রি করে থাকে। দু চার টাকা পায়। পিচ্চিটা কল্লোলকে মালা কেনার প্রস্তাব দেয়।

'আরি এই পিচ্চি কোত্থেকে এল। এই কী ভাবছিস? আমরা প্রেম করতে আসি নাই। এইটা আমার বউ!' কল্লোল তার অতিরিক্ত দাঁতটা বের করে বলে।

'ওইটা আপনের বউ? বউ হইলে দুইটা মালা দেন। ডাবল। কিন্তু দাম একটারই নিমু'। পিচ্চিও কম চটপটে নয়।

'হা হা হা। নিই দুটো, কী বলো সীমা। দে রে পিচ্চি। দে। কত দাম?' কল্লোল জিজ্ঞেস করে।

'খুশি হইয়া যা দেন।'

'খুশি হয়ে দিতে হবে। মুশকিলে ফেললি রে। নে তাহলে একশ টাকা? খুশি?'

'আপনে খুশি মনে দিছেন তো!'বালিকাও মুখে হাসি আর গম্ভীরতা একই সঙ্গে ফুটিয়ে বলে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। নে। নতুন একশ টাকার নোট দিলাম। খুশি মনেই দিলাম।' কল্লোল আবার হাসে।

'খুশি মনেই নিলাম। লন আপনের দুইটা মালা। আপারে পরায়া দেন।' বালিকাটি হাত বাড়িয়ে মালা দেয়।

'থ্যাংক ইউ।' কল্লোল ধন্যবাদ জানায়।

'ইউ আর ওয়েল কাম।'পিচ্চি প্রত্যুত্তর দেয়।

'কী কইলি রে পিচ্চি?'

'হি হি। আপনে আমারে থ্যাংক ইউ কইছেন না? জবাব দিলাম। ইউ আর ওয়েলকাম।'

'ওরে বাবা। তুই এত কিছু জানিস?'

'না স্যার। বেশি কিছু জানি না। মাত্র নয় বছর বয়স তো। জাননের বহুত বাকি আছে। স্যরি। আমি কাবাব মে হাড্ডি হইয়া আছি কেন? আপনেরা গল্প করেন, আমি যাই।'

'দেখছ সীমা, কী রকম কথা জানে।'

'তাই তো দেখছি। বাপরে। আজকালকার মেয়ে! ওই দেখো আবার কী বলে!' সীমার চোখে মুখেও বিস্ময়।

'শুনেন, স্যার। শুনেন আপা। বিয়ার পরে কেউ এই জায়গায় আহে না। আপনারাও আইবেন না। হা হা হা। আমি যাই। দিলাম দৌড়। হা হা হা।' পিচ্চি মেয়েটি দৌড়ে এলাকাটা ছাড়ে।

'কী বলল। শুনলা, কল্লোল?' সীমার মুখে হাসি।

'তুমিই শোনো। বিয়ের পরে নাকি এইখানে কেউ আসে না। হা হা হা। সীমা আমরা কিন্তু আসব।'

'তার মানে কি সাহেব? আমাদের বিয়ে হচ্ছে?'

'আই এম নট শিয়োর। আগে তো তুমি আমার গল্পটা শোনো। তারপরে না বিয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন। তাই না?'

'তাইলে বাপ কথা না পেচিয়ে বলে ফেললেই তো পারো। কেন তোমার মনে হচ্ছে সব ছিল ভুল।'

'সেই গল্পটাই তো করছি।'

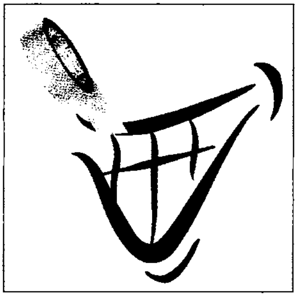

জায়গাটা সত্যই সুন্দর। ঢাকা থেকে খানিকটা দূরে। পাকা সড়ক থেকে কয়েক পা হাঁটলেই একটা বটগাছ। তার নিচটা পাকা। সামনে নিচু জমি, বছরের বেশির ভাগটা সময় জল থই থই করে। এরই মধ্যে তুরাগ নদী মিলে মিশে প্রবাহিত হচ্ছে। লঞ্চ যায় এই নদীপথে। অনেক নৌকাও যায়। কিছু কিছু ডিঙি নৌকা আবার প্রমোদভ্রমণের জন্যে। একশ টাকা ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া পাওয়া যায়।

সীমা আর কল্লোল বসে আছে পাশাপাশি। ঘাসের ওপরে। সঙ্গে পত্রিকা ছিল। সেটা বিছিয়ে নিয়েছে তারা। সংবাদপত্র মানবজীবনের নানা কাজে লাগে।

'এই পৃথিবীতে মানুষ থাকে নানা রকম? তাই তো?' কল্লোল বলল।

সীমা দূরে একটা লঞ্চের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ না সরিয়েই সে বলল, 'আমি বেশি রকম মানুষ দেখিনি। যা দেখেছি সবারই দুটো চোখ একটা নাক।'

'কিন্তু সীমা প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরটা আলাদা। একেকজন একেকরকম।'

'আচ্ছা বলো।'

'তো বিভিন্ন প্রকার মানুষের মধ্যে আমার মামি হচ্ছেন একটা বিশেষ প্রকার। ভেরি স্পেশাল।'

'তোমার মামির স্পেশালিটিটা কী বলো তো শুনি।'

'ও সীমা। তিনি হলেন, তিনি হলেন, যাকে বলে শুচিবায়ুগ্রস্ত।'

'তুমি খুব কঠিন কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করছ, কল্লোল।'

'আরে সীমা। আমি বাংলায় পাস করেছি না। বাংলা শব্দ আমার কাছে সবই সহজ লাগে। তোমার কাছে যেমন ইংরেজি শব্দ মানেই সহজ। যে কথা বলছিলাম। আমার মামীর সব গুণকেই হবে বলতে মহৎ গুণ, শুধু একটাই

তার বাতিক, তিনি সব সময় পরিষ্কার থাকতে চান, সবকিছুকে পরিষ্কার রাখতে চান। পরিষ্কার আর ছিমছাম। আর গোছানো।'

'ভালো তো। পরিষ্কার থাকা তো খুবই ভালো কথা।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। তিনি তার ঘরবাড়ি প্রতিদিন ৭ বার করে মোছেন, প্রত্যেকবার ডেটল স্যাভলন এইসব দিয়ে মোছেন।'

'যাহ। তুমি সব সময় বাড়িয়ে কথা বলো।'

'অতি সামান্য বাড়াই। যেমন আসলে তিনি ৭ বার না, ৬ বার ঘর মোছান। আর একশ পঁচিশবার সামনে যা পান, তাই মোছান। যেমন ডাইনিং টেবিলটা মুছেছিস? হ আম্মা। মুছছি। আবার মোছ। ওই তুই যে ডাইনিং টেবিল মুছলি, তার আগে তুই নিজের হাত ধুইছিলি। যা। ভালো করে ডেটল সাবান দিয়ে আগে তিনবার হাতটা ধো। তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে হাত মোছ। হ্যাঁ হয়েছে। এবার যা। ডাইনিং টেবিলটা আরেকবার মোছ।'

'হি হি। তুমি এত চমৎকার করে বানিয়ে গল্প করো যে আমি মুগ্ধ না হয়েই পারি না।'

'আরে কিসের বানাচ্ছি? একদম বানাচ্ছি না। তিনি তার ড্রয়িং রুমের কার্পেটটাকে তার নিজের মুখমণ্ডলের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। মানুষ নিজের মুখ আয়নায় দেখে, পরিষ্কার টরিষ্কার রাখে, কিন্তু তার একটা লিমিট আছে। আমার মামি হলেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আনলিমিটেড।'

'তো তোমার মামির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাতিকের সাথে আমার বিয়ের কী সম্পর্ক সেটা তো বুঝলাম না।'

'আরে প্রথমেই সম্পর্ক খোঁজো ক্যান। পুরা গল্প আগে শোনো।'

'খালি শোনো শোনো করো ক্যানো? বলে ফেললেই তো পারো।'

'সেই গল্পই তো করছি। এটা হলো ভূমিকা। কারণ গল্পে মামির ভূমিকা খুবই ইম্পর্টান্ট। ভিভিআই।'

'ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট।'

'হুঁ। আমি বেচারা মফস্বলের ছেলে। গ্রামের কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করেছি। আর ইন্টারভিউয়ের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় এপ্লিকেশন জমা দিচ্ছি। আমার একটা ইন্টারভিউয়ের কার্ড এল। গ্রামের ছেলে। দেখেই বুঝতে পারছ সহজ-সরল।'

'না তো, বুঝতে পারছি না তো।'

'সহজ সরল মনে হচ্ছে না?'

'না, মনে হচ্ছে বোকা। মাথায় ঘিলু টিলু কিছু নাই।'

'সে তো আমার পছন্দ দেখলেই বোঝা যায়। কার পাশে বসে আছি?'

'তোমার সবই খারাপ। খালি পছন্দটা ভালো। আর আমার সবই ভালো। কিন্তু পছন্দ খারাপ। আচ্ছা বলো। তোমার মামির গল্প হচ্ছিল। তোমার ইন্টারভিউ কার্ড এল।'

'হ্যাঁ। ঢাকায় ইন্টারভিউ। সেই ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্যে আমাকে ঢাকায় আসতে হবে। তো আমি নাইটকোচে চড়ে বসলাম। ঢাকায় এর আগে কখনও আসিনি। মনে ভয়, মাথায় নানা দুশ্চিন্তা। একটাই ভরসা। লুঙ্গিতে বেঁধে চিড়া নিয়েছি এক পোটলা। নারকেল নিয়েছি চারটা। জীবন্ত মুরগি ছয়টা। শুনেছি ঢাকার লোকে খুব মুরগি পছন্দ করে। আর ঢাকায় মুরগির খুব দাম। মামি এইসব পেলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।'

'হি হি হি।'

'হাসছ কেন?'

'না হাসছি না। বলো তুমি।'

'তো আমি সকাল সকাল তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। দারোয়ান আটকে দিল।

বলল, কাকে চাই?

আমি বললাম, আমি আমার মামার কাছে যাচ্ছি। জনাব মো. শওকত হোসেন।

দারোয়ান বলল, আপনের নাম কি কলকল?

আমি বললাম, কলকল না। কল্লোল, তবে কলকল আর কল্লোল, দুইটা শব্দের একই মানে।

'হ হ কল্লোল। যান আপনে ভিতরে যান।' দারোয়ান আমাকে অপূর্ব অভ্যর্থনা জানাল।

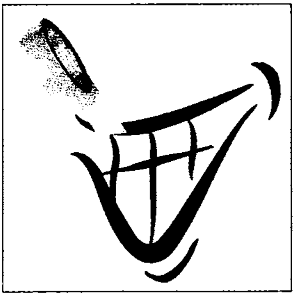

সীমা বলল, আচ্ছা, এই যে লঞ্চগুলো যাচ্ছে, ওরা কোথা থেকে কোথায় যায়?

কল্লোল বলল, আমি তো ঠিক জানি না।

'এই একটা নৌকা ভাড়া করে চলো সারাদিন দুইজনে ঘুরি।'

'না রে। একটা অসুবিধা আছে।'

'কী অসুবিধা?'

'এইখানকার পুলিশগুলো নৌকায় যুগল দেখলে খুব রাগ করে। আমার একটা বন্ধু, ও একটা বেসরকারি ইউনিভার্সিটির টিচার, তার বাগদত্তা প্রেমিকাকে নিয়ে এসেছিল। সারাদিন নৌকায় ঘুরে ফিরে যেই না ঘাটে এসে নেমেছে, অমনি পুলিশ ওদের ধরেছে। বলে, বিয়ে হয়েছে? কাবিননামা আছে? নাই। তাহলে ব্যাং লাফ লাফাতে হবে। ব্যাং লাফ বোঝো। মাটিতে তুমি বসবে আলগাভাবে। তারপর তোমার হাত দুই পায়ের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে আবার বুড়ো আঙুল ধরতে হবে। এবার লাফাও। টিচার মানুষ। প্রেমিকার সামনে তাকে এইভাবে চল্লিশ কদম ব্যাং লাফ লাফাতে হয়েছে।'

'হায় হায়। চলো ফিরে যাই। তোমাকে যদি আবার ব্যাং লাফ দিতে বলে।'

'বলবে না। আমার কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া সার্টিফিকেট আছে। আমি একজন সাহসী এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। আমি পুলিশের বন্ধু।'

'তুমি পুলিশের বন্ধু, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু পুলিশ তোমার বন্ধু তো?'

'পুলিশ জনগণের বন্ধু।'

'আচ্ছা এবার তাহলে তুমি তোমার গল্পটা বলো। দারোয়ান তোমাকে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। তারপর?'

'তারপর বাড়ির দ্বিতীয় দরজায় হাজির হলাম। দোতলা বাড়ি।

নিচতলায় ভাড়াটেদের থাকার কথা। কিন্তু ওই সময় বাসাটা খালিই ছিল। মামা থাকেন দোতলায়। দারোয়ান পথ দেখিয়ে দিল। আমি দোতলায় উঠলাম। দোরঘণ্টি বাজালাম। আমার হাতে চিড়া, নারকেল এবং মুরগি।

দরজা খুলল একজন মধ্য বয়স্ক গৃহপরিচারিকা। তার নাম পরে জানা যাবে, সখিনা।

আমি বললাম, মামা আছেন?

সে দরজা ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

আমি আবার বললাম, শওকত হোসেন আমার মামা হন।

সে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। বিশাল বৈঠকখানা। আমি তাতে বসে রইলাম। হাতের পোটলা, নারকেল কার্পেটে রাখলাম। মুরগিগুলো অবশ্য বুদ্ধি করে বারান্দায় রেখেছি।

'আমি বসে আছি মামির অতি যত্নে গড়া বাসার অতীব পরিচ্ছন্ন ড্রয়িং রুমের সোফায়, অমূল্য কার্পেটের ওপরে জুতাসমেত আমার দুই পা। মামি এলেন। আমি তাকে ভক্তিপূর্ণ সম্ভাষণ জানালাম। আসসালামু আলাইকুম।

মামির চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, তিনি বললেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাবা কল্লোল!

'জি মামি।'

'বাবা আমার কার্পেটটা আমি ইতালি থেকে আনিয়েছি। তোমার দুইটাকার জুতার পদধূলি দিয়ে ওটাকে অপমান কোরো না। জুতা দুইটা খুলে রেখে আসো।'

আমি বললাম, 'বাটার জুতা মামি। ১৬৯৫ টাকা দাম!'

মামি গলাটায় যথেষ্ট পরিমাণে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, যা বলছি শোনো।

আমি বাইরে গিয়ে জুতা খুললাম। মোজা দুটো কী করব বুঝছিলাম না। একটু দুর্গন্ধও যে হয়নি তা বলতে পারব না। বুদ্ধি না পেয়ে নিজের পকেটেই রেখে দিলাম। বোঝোই তো। সরল সোজা ছেলে।

মামি বললেন, এখনই চলে যাবে? নাকি আরেকটু পরে যাবে? চা খেয়ে যাবে?

আমি বললাম, আমি মামি কয়েকদিন থাকব। আমার একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে। মামাই আমাকে আসতে বলেছেন।

মামি খুব সুন্দর করে হাসলেন। আমার কলজে জুড়িয়ে গেল। তুমি দেখলে তুমিও মুগ্ধ হয়ে যেতে। মামি বললেন, 'তোমার মামার কথায় জগৎ

চলতে পারে। আমার বাসা চলে না। আমি অনেক যত্ন করে ফ্লাট সাজিয়েছি। তোমার মামার ভাগ্নে ভাগ্নিদের জন্যে হোটেল খুলি নি।'

'আমার তো আর যাওয়ার অন্য কোনো জায়গা নাই। আর আমি চাকরির ইন্টারভিউটা না দিয়ে কোথাও যাচ্ছিও না'। আমি হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, 'মামি নারকেল এনেছিলাম। আর এটাতে আছে কিছু চিড়া আছে।'

মামি বললেন, 'নারকেল তো এ বাড়ির কেউ খাবে না। আমার পেপটিক আলসার। তোমার মামার হাই কোলেস্টরেল। তুমি নিয়ে যাও। আর তুতুল তপু তো বিদেশে। কাজেই...আর লুঙ্গিতে বেঁধে চিড়ামুড়ি এনেছো। ঢাকা শহরের কাকদের দিলেও তারা খাবে কিনা সন্দেহ। মানুষের রুচি না থাকতে পারে, কাকদের আছে। বেলা থাকতে থাকতে তুমি ওঠো...

আমি ভাবলাম, খানিকটা সময় নেওয়া দরকার। বললাম, চা দিতে চেয়েছিলেন। চা খাই।

মামির দয়ার শরীর। বললেন, আচ্ছা। বসো। সখিনাকে চা দিতে বলছি। চা খেয়েই উঠে চলে যাবে। আমার কার্পেটটা ভ্যাকুয়াম করতে হবে।

কথাটার মানে তখন বুঝিনি। এখন বুঝছি। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে মামি কার্পেট পরিষ্কার করবেন।

আমি বললাম, মামি মুরগিগুলো? মুরগিগুলো বারান্দায় পড়ে আছে।

মামি বললেন, মুরগি মানে?

আমি বললাম, কয়েকটা মুরগি এনেছিলাম। বারান্দায় রেখেছি।

তিনি বললেন, বারান্দায় কেন রেখেছ। সখিনার হাতে দিয়ে দিলেই পারতে। ও ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে পারত।

আমি বারান্দায় গেলাম। মুরগিগুলোকে ধরে নিয়ে এলাম। এই যে মামি মুরগি!

তিনি বললেন, সর্বনাশ। তুমি জ্যান্ত মুরগি আমার বারান্দায় রেখেছ?

আমি বললাম, মামি আপনারা মুরগি খান না?

মামি বললেন, মুরগি কি আমরা পালকসমেত খাই? বাজার থেকে ড্রেসিং করা মুরগি কিনে আনি।

আমি আশ্চর্য। মুরগিকে ঢাকার লোকেরা ড্রেস পরায় নাকি? আমাদের গ্রামে শীতের সময় গরুকে অনেক সময় চট পরায় বটে, কিন্তু মুরগির ড্রেসের কথা এই প্রথম শুনলাম।

এই সময় আমার হাতে ধরা অবস্থাতেই মুরগি প্রাকৃতিক কর্ম সেরে ফেলল।

সীমা হেসে উঠল খিক খিক করে। 'তোমার এই রকম ম্যানিয়াক মামির দামি কার্পেটের ওপরে মুরগি বাথরুম সারল?'

কল্লোল বলল, 'সারবেই তো। মুরগিও তো একটা প্রাণী। তারও ডাইনিং টেবিলে বসতে হয় আবার বাথরুমও সারতে হয়। তাই না?'

সীমা হাসি চাপার জন্যে মুখে আঁচল গুঁজে বলল, 'তারপর?'

'মামি বললেন, তুমি বের হও ঘর থেকে। সখিনা, সখিনা, এই দিকে আয় ছুড়ি। এই সব নিয়ে ও ঢুকতে পারল কী করে?

আমি কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না। এই সময় আমার হাত থেকে একটা মুরগি গেল ছুটে। আমি বাকি মুরগিগুলোকে মেঝেতে রেখে ছুটন্ত মুরগিটাকে ধরার জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। মুরগি ড্রয়িং রুমের এককোণে লুকিয়ে পড়ল। আমি সেটা ধরার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেই একটা শো পিস পড়ে দুই টুকরা হয়ে গেল। তবে মুরগিটা আমি ধরেছি।

সখিনা এল। বলল, মুরগি আপনে নিচে দারোয়ানের কাছে দিয়া আহেন। অরে কন, বাজার থাইকা ড্রেসিং কইরা আনব।

আদেশ পালন করতে আমি বাধ্য। মুরগি নিয়ে আবার আমি গেলাম নিচে। দারোয়ানের কাছে।

তারপর আবার এসে বসলাম সোফায়।

মোজা দুটো পকেট থেকে বের করে সোফার হ্যান্ডেলে রেখে দিলাম।

সীমা চিৎকার করে উঠল, এই তুমি খুবই খবিস আছো। সারা রাত জার্নি করেছ নাইট কোচে। আর মোজা দুটো একবার পকেটে রাখছ, একবার সোফার হ্যাতলে রাখছ। তোমার সাথে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষেই থাকা সম্ভব নয়।

কল্লোল ওর গালটা টিপে দিয়ে বলল, 'আমি কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকব না। আমি থাকব ভদ্রমহিলার সঙ্গে।'

'আচ্ছা তারপর কী হলো বলো' সীমার আগ্রহের কমতি নেই।

'তারপর গৃহপরিচারিকা ট্রলি ঠেলে এক কাপ চা একটা টোস্ট বিস্কিট দিয়ে গেল। পানিও দিল।'

'গৃহপরিচারিকা মানে?'

'ওই তো কাজের মেয়ে সখিনা।'

'তুমি প্রায়ই কঠিন শব্দ ইউজ করো।'

'হ্যাঁ। বাংলায় পাস। তার ওপর সদ্য গ্রাম থেকে আসা।'

'আচ্ছা কাজের মেয়ে সখিনা একটা টোস্ট বিস্কিট আরেক কাপ চা দিল। তারপর?'

'পানিও দিল। আমি গ্লাস থেকে পানি ট্রের ওপরে ঢেলে হাত ধুতে লাগলাম। মামি উঁকি দিলেন। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, এই তুমি ট্রেতে হাত ধুচ্ছ কেন?'

আমি তার কণ্ঠের তীব্রতায় ভড়কে গিয়ে কার্পেটে পানি ফেলে হাত ধুতে লাগলাম।

মামি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, এই গাওয়ার কোথাকার। দিল আমার কার্পেটটা নষ্ট করে.... আমার ইতালি থেকে ইম্পোর্ট করে আনা কার্পেট....

আমি বললাম, স্যরি স্যরি।

আর সোফায় মোজা মেলে দিয়েছ কেন? উফফ। গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সখিনা। বেটা গেলে সোফাটায় এন্টিসেপটিক স্প্রে করে দিবি।

(কল্লোলের গল্প শুনে সীমা ভয়াবহ রকমের হাসতে শুরু করে দিল। তার হাসি আর থামেই না। মনে হচ্ছে তার হিস্টিরিয়া হয়ে গেছে। এই হাসি থামাতে হলে তাকে ইনজেকশন দিতে হবে। হি হি হি, হা হা হা, খিল খিল, হো হো, খুক খুক। কত রকমের হাসিই যে সীমা হাসছে। কল্লোল গল্প বলেই যাচ্ছে।)

'আমার হাত পা কাঁপছে। ভদ্রমহিলা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড উত্তাপে আমার হাত এমন ভাবে কাঁপছে যে আমার হাত থেকে চায়ের কাপ গেল পড়ে। পড়বি তো পড়, সোফার ওপরে। সোফাটাকে চা-রঞ্জিত করে আরেক লাফে তা বেছে নিল ইতালিয় গালিচার বুক।

'হা হা হা।' সীমা হাসি চাপার চেষ্টা করে খানিকটা হেসে নিয়ে বলল, 'তুমি অনেক ভালো গল্প বলতে পারো। ইউ আর আ গ্রেট স্টোরি টেলার। আমি বুঝছি তুমি সব কিছু বানিয়ে বলছ। তবু আমার শুনতে ভালো লাগছে। তুমি বলো। মামির তখন কী অবস্থা?'

কল্লোল বলে চলল, মামির মুখ দেখে মনে হলো তিনি এখনই গেয়ে উঠবেন, আমি জ্ঞান হারাব, মরে যাব, পালাতে পারবে না তো। মুখে অবশ্য গান নয়, তার মেশিনগান থেকে গুলি বের হলো, এই ছেলে। তুমি এখনই যাবে। তুমি থাকলে আমি হার্টফেইল করেই মরে যাব।

ওঠো ওঠো...

উঠব কিনা ভাবছি।

সখিনা বলল, আম্মা, দেহেন, শো পিস ভাইংগা দুই টুকরা করছে।

আমি বুঝলাম, এই বাসায় আর আমার থাকা হবে না।

মামি দুই হাতে শো পিসটার দুই টুকরা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সোনালি ফ্রেমের চশমার নিচ দিয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রুকেও মনে হচ্ছে সোনালি।

এই সময় মামা এলেন। 'আরে কল্লোল। বাবা কখন এসেছিস?' মামার মুখে হাসি। মনে হলো, সবুজ ঘাসের দেশ দেখলাম দারুচিনি দ্বীপের ভেতর। আমিও হেসে বললাম, 'এই তো কিছুক্ষণ আগে মামা।'

মামা বললেন, কিছুক্ষণ আগে তো এখনও কাপড়চোপড় পাল্টাস নি কেন? রানু ওকে ওর রুম দেখিয়ে দিয়েছ।

মামি অকপট, কোনো ভণ্ডামি নাই, বললেন, ওর থাকার মতো কোনো রুম তো আমার এই ছোট্ট বাসায় নাই।

মামা তার চেয়েও এক কাঠি বেশি অকপটতা প্রদর্শন করে বললেন, কেন। তপুর রুমটাতেই ও থাকতে পারে। ওটাতো খালিই পড়ে আছে।

ওটা খালি পড়ে আছে মানে। ওটা আমার ছেলের স্মৃতি। ওই রুমে ওর খাটে আমি আর কাউকে শুতে দেব?

মামা বললেন, স্মৃতি কখনও রুমে থাকে না। স্মৃতি থাকে মনে।

মামি বললেন, তুমি আসো ভেতরে আসো। তোমার সাথে কথা আছে।

মামা আর মামি ভেতরে গেলেন।

আমি তাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেয়ালের তৈলচিত্র বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। যেন আমার মতো শিল্পবোদ্ধা এই শহরে আর দ্বিতীয়টি নাই। আসলে আমি কান পেতে আছি মামা-মামির ভেতরে কী সংলাপ বিনিময় হয় তা শোনার জন্যে। ঢাকার বাইরে থেকে যে আসে, যার কোনো থাকার জায়গা থাকে না, আশির দশকের টেলিভিশন নাটকের মতো যে ওঠে মামার বাড়িতে (কিংবা রবীন্দ্রনাথের *ছুটি* গল্পের মতো), তাকে অস্তিত্বের সংগ্রামে ডারউইনের বানরের চেয়েও বেশি অভিযোজন ক্ষমতার পরিচয় দিতে হয়, তার ফলেই সে ফিটেস্ট হিসাবে সারভাইভ করে।

আমি কান খাড়া করে শুনছি, মামি বলছেন, শোনো। এটা আমার অনেক শখ করে সাজানো বাড়ি। আমি কোনো বাইরের লোক এখানে থাকতে দেব না।

মামা বলছেন, ওতো বাইরের লোক না।

'ভব্যতা জানে না। জুতাভরা কাদা। সেটা পরে এসে কার্পেটের কী অবস্থা করেছে।'

'আজকে ধরো প্রেসিডেন্ট ওবামা এলেন। কৃষিখামার ভিজিট করে এসে আমাদের বাসায় উঁকি দিলেন। ওনাকে কি বলবে জুতা খুলে আসতে।'

'আমি বলব। প্রমাণ চাও। ওনাকে আসতে বলো। দেখবে জুতা না খুলে আমি ওনাকে ঢুকতে দিচ্ছি না।'

মামা হেসে ফেললেন। হা হা হা। 'তোমার এই পরিষ্কারের বাতিক আর ঘরদোর করে জীবন দিয়ে ফেলা, এটা কিন্তু মেন্টাল কেসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।'

'এটা তুমি কী বললা? আমি পাগল?'

'না না। এখনও ওই পর্যায়ে যাও নি। কিন্তু যেতে কতক্ষণ। আমিও তো পাগল হয়ে যেতে পারি। তুমিও পারো।'

'পাগল হয়েই যাব, যদি ওই ছেলে আর এক দণ্ড এই বাড়িতে থাকে।'

'না না। তোমার পাগল হওয়া চলবে না।'

'হলে ওকে যেতে বলো।'

'যেতে বলতে আমি তাকে পারি। কিন্তু তার সাথে আমার নিজেকেও তাহলে চলে যেতে হয়।'

'এই কথা তুমি বলতে পারলে! আমার চেয়ে তোমার ওই গাঁইয়া ভাগ্নেই বড় হলো?'

'এই তুলনায় তোমার যাওয়ার দরকার কী? ও এসেছে দুদিনের জন্যে। দুদিন থেকে চলে যাবে। আর তোমার আমার সম্পর্ক তো দুই দিনের না। চিরদিনের। মৃত্যুর পরেও তুমি আমি এক সাথে থাকব। যদি বাবা মায়ের দোয়ায় হেভেনে যাই তোমার আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বাতিক করতে হবে না। হেভেন নিশ্চয়ই ঝকঝকে তকতকে হবে। আর হেভেনে যদি যেতে হয় একজন আশ্রয়প্রার্থীকে অবশ্যই আশ্রয় দিতে হবে।'

'ভারি তো সৎ বোনের ছেলে। তার জন্যে তুমি এত বড় কথা বলতে পারলে?'

'সেইটাই আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি। ওর মা আমার সৎ বোন। আমার চেয়ে বছর কয়েক বড় ছিলেন। কল্লোল তখন খুব ছোট। মাস তিনেক হবে ওর বয়স। আমার বয়স তখন ১৪/১৫। একদিন আমি বাঁশের সাঁকো পার হচ্ছিলাম। ভরা বর্ষা। সাঁকো ভেঙে পানিতে পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়েই

আমি অজ্ঞান। ওর মা সাথে সাথে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে টেনে তুললেন। অজ্ঞান শরীরটা তোলা কি সোজা কথা। আমাকে কোনো রকমে তীরে ঠেলে দিয়েই নিজে পড়ে গেলেন পানিতে। শাপলা শালুকের লতায় তার পা পেঁচে গিয়েছিল। তিনি তলিয়ে গেলেন।

আমি বাঁচলাম। তিন মাসের কল্লোল এতিম হয়ে গেল। সেই কল্লোল আজকে এসেছে আমার বাসায়। আমি তাকে তাড়িয়ে দেব। এইটা হয়?'

মামার গলা ধরে এসেছে। আমারও চোখের কোণে জল উঁকি দিচ্ছে। গলার কাছটা ধরা ধরা।'

সীমা তাকাল কল্লোলের দিকে। এই খোলা আকাশের নিচে গল্প বলতে গিয়ে কল্লোলের চোখে আবারও জল ছল ছল করছে। '

সীমার নিজের গলাই ভেজা ভেজা। চোখ আর্দ্র। সে বলল, 'আসলেই। এই রকম একটা ভাগ্নেকে কেউ দূরে ঠেলে দিতে পারে? তোমার মামিটা না একটা জানি কেমন? তারপর কী হলো বলো!'

'আমি বললাম মামি আমাকে শুধু আজকের রাতটা থাকতে দেন। আমি দুইদিন পরে ইন্টারভিউ দিয়েই চলে যাব। রাতের গাড়িতেই উঠব। মামি রাজি হলেন। বললেন, ঠিক আছে। শুধু দুই দিন। থাকো। তবে ওই মোজা দুইটা ওখান থেকে সরাও। আর সখিনা, সখিনা, ওর মোজার জায়গাটায় স্প্রে করে দে।'

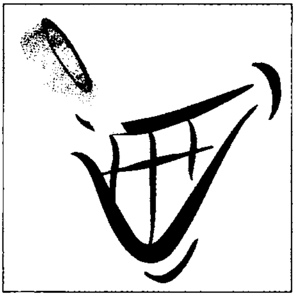

সীমা আঙুলের ডগায় শাড়ি পেঁচাতে পেচাতে বলল, ‘ কিন্তু কল্লোল, তোমার সাথে আমার দেখাটা হলো কবে?’

‘ওই তো ইন্টারভিউয়ের কয়েক দিন পরে। আর ইন্টারভিইয়ের দিনটা ছিল ভুলে ভরা একটা দিন।’

‘আবার বলছ তুমি এইটা ভুলে ভরা দিন। তোমার ঘটনা কী?’

‘আগে শোনো...পরের দিন আমার ইন্টারভিউ। মামা বলেছেন, শোন, নয়টার মধ্যে অফিসে গিয়ে হাজির থাকবি। আমি তোকে আটটার সময় আমার গাড়িতে করে নিয়ে রওনা হবো। আমি সকাল ৬টার এলার্ম দিয়ে রাখলাম আমার মোবাইল ফোনে।

কিন্তু এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার মোবাইল ফোনটা হ্যাং করেছিল।

আমি মোবাইল ফোনের ব্যাটারি খুলে ফেলেছিলাম। ফলে আমি ৬টার সময় এলার্ম দিয়ে রাখলাম বটে, কিন্তু বাস্তবে মোবাইলের এলার্ম যখন বেজে উঠল, তখন মনে হয় রাত দুইটা তিনটা বাজে।

আমি তো আর সেটা জানি না। আমার মোবাইলে তো ৬টা। আমি ঘুম থেকে উঠে বসলাম। চোখ রগড়ে বিছানা ছাড়লাম।

সীমা বলল, ‘রাত দুইটার সময় ভোর ৬টা ভেবে উঠে পড়লা?

‘হ্যাঁ উঠলাম।’

‘তারপর?

‘তারপর ঘটতে লাগল একের পর এক ঘটনা। সেই গল্পটাই তোমাকে বলতে ডেকেছি। এই গল্পটা হাসির।’

‘আরে হাসির গল্প হাসির গল্প করছ সারাক্ষণ। গল্পটা বলে ফেললে কী হয়!’

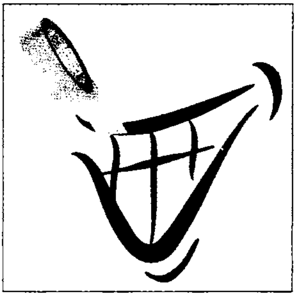

'আমি ঘুম থেকে উঠে গেলাম বাথরুমে। আয়নায় নিজেকে দেখলাম। বড়লোকের বাড়ির বাথরুম। ঝকঝকে আয়না। ঘুমভরা চোখ। চোখের নিচে পিচুটি। নিজেকে বললাম, শুভ সকাল। ঘুম ভালো হয়েছে? এবার রেডি হোন। আজ আপনার ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে।

টুথব্রাশ হাতে নিলাম। টুথপেস্ট নিলাম। মুখের ভেতরে ব্রাশ চালান করে দিলাম।

দাঁত মাজছি।

মুখের মধ্যে এই রকম বিস্বাদ লাগে কেন। তাকিয়ে দেখে বুঝলাম আমি টুথপেস্ট মনে করে যে টিউব থেকে পেস্ট বের করেছি, তার গায়ে লেখা শেভিং ক্রিম। তাই তো বলি, টুথপেস্টের স্বাদ এত বিশ্রি হবে কেন। আমি তো টুথপেস্ট নয়, শেভিং ক্রিম দিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করেছি।'

'হি হি হি। এতক্ষণে তুমি হাসির একটা ঘটনা বলতে পারলা'। সীমা গড়িয়ে পড়তে লাগল কল্লোলের গায়ে। বলা বাহুল্য, তাতে কল্লোলের ফূর্তি আরও বেড়ে গেল।

সে বিপুল উৎসাহ নিয়ে বলে যেতে লাগল, 'থু থু করলাম খানিকক্ষণ। মনে হলো, ইস পুরো জিভ আর দাঁত আর মুখগহ্বরটা যদি বের করে ধুয়ে ফেলতে পারতাম।'

'তারপর?' সীমার চোখেমুখে কৌতূহল।

'তারপর ভালো করে কুলি করে টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করলাম। এবার আর ভুল করলাম না। মানুষ ঠেকে শেখে। আমিও শিখলাম। মুখ ধোওয়া হলো। এবার গোসল। বাথরুমে ঢুকে পড়ি। শাওয়ার ছাড়ি। চোখেমুখে গায়ে পায়ে সাবান মাখি। হাত থেকে সাবান ছিটকে পড়ে গেল। সেটা আর খুঁজে পাই না। চোখে পানি দিয়ে চোখদুটো ধুয়ে তারপর সাবান খুঁজতে হবে। শাওয়ার ছাড়লাম। দেখি এক ফোঁটাও পানিও নাই।

ঢাকা শহরে যে ট্যাপের পানি শেষ হয়ে যেতে পারে, সেটা তো আর জানতাম না। পানি শেষ হয়ে গেলে কী করতে হয় তাও জানা ছিল না। তো কী আর করি। তোয়ালে দিয়ে চোখটা ভালো করে রগড়ে নিলাম। চোখের এলাকাটা পরিষ্কার হলো।

তবু কি চোখ খুলে রাখা যায়?'

'কেন? চোখ খুলে রাখা যাবে না কেন?' সীমার চোখে কৌতুক আর উদ্বেগ।

কল্লোল বলে, 'ভীষণ জ্বালা করছে যে!

চোখ বন্ধ। হাতড়ে হাতড়ে পথ হাঁটছি। উদ্দেশ্য বড়ই মহৎ। ডাইনিং স্পেস থেকে যদি একটা পানির জগ জোগাড় করতে পারি। তাহলে আমার ভীষণ যন্ত্রণাময় চক্ষুদুটি একটু আরাম পাবে।

কিন্তু চোখ বন্ধ করে নতুন জায়গায় পথচলা নিরাপদ নয়। একটা জায়গায় হোঁচট খেলাম। হাত বাড়িয়ে যা ধরতে যাব, তাই গেল পড়ে। মামির খুবই শখের দুই দুইটা ফুলদানি ফেলে দিলাম। ভেঙে গেল। রাতের নীরবতা ভেঙে তারও চেয়ে জোরে শব্দ উঠল।

মামা আর মামি জেগে উঠলেন'

'কী করে বুঝলে মামা আর মামি জেগে উঠলেন?'

'আরে তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি না?

মামি বলছেন, এই বাড়িতে চোর এসেছে নাকি?

মামা বলছেন, যাহ। চোর আসবে কোত্থেকে?

'বাইরের লোক ঘরে রেখেছ। বলা যায়। মোবাইল ফোনে ডেকে এনে হয়তো বাড়িতে ডাকাত ঢুকিয়েছে!'

আমি পা টিপে টিপে হাঁটছি। ফুলদানির ভাঙা টুকরা পায়ের নিচে পড়তেই আউ করে আর্তনাদ করে উঠি। সরে যেতেই ডাইনিঙের একটা চেয়ারে বাড়ি খাই। সেটা ধপাস করে পড়ে যায়। একটা চেয়ারের পতনের শব্দ যে একটা বোমার পতনের সমান হতে পারে, সেই রাতের আগে আমার জানাই ছিল না।

মামি বললেন, চোর নয়। ডাকাত। আমার ঘরের সব আলমারি টালমারির ড্রয়ার ট্রয়ার ভাঙছে। হাতে নিশ্চয়ই বন্দুক টন্দুক আছে।

মামা বললেন, চলো দরজা খুলে দেখি।

এই সময় বন্দুকের গুলির আওয়াজ হলো। আসলে একটা টেবিলল্যাম্পের সঙ্গে বাড়ি খেলাম। সেটা আলতো করে গড়িয়ে পড়ল। তার

বাল্বটা ঠাস করে ফেটে গেল। শূন্যস্থান পূর্ণ করতে বায়ু গেল ছুটে। শব্দটা হলো ঠিক গুলির শব্দের মতো।

মামি বললেন, না না। খবরদার না। এই শুনলে গুলির শব্দ হলো। ওদের হাতে অস্ত্র আছে। দরজা খোলা মাত্রই গুলি করে দেবে।

মামাও উদ্বিগ্ন, তাহলে কী করব?

মামি বললেন, থানায় ফোন করো। বলো বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

মানে ডাকাত আদৌ পড়েছে কিনা শিয়োর হয়ে নিলে হতো না।

কীভাবে?

দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখি।

আরে কী বলে? আত্মহত্যা করতে চায় নাকি! দাও ফোন দাও। আমি ফোন করছি। মামির গলা, হ্যালো টেলিফোন ইনকোয়ারি। আমাদের বাসায় ডাকাত পড়েছে। কাকে ফোন করব বলেন তো। নাম্বারটা বলেন।

বলেন আমি নোট করে নিচ্ছি। আরেকটা মোবাইলে নাম্বার টুকে নেয়।'

সীমা হেঁচকি তুলে হাসছে। উফ। মেয়েটাকে হাসলে এত সুন্দর দেখায়। গালে টোল পড়ে।

তারপর সে বলল, তোমার মামা মামি ভয় পাচ্ছেন। থানায় ফোন করছেন। আর তুমি তাদের বলছ না যে বাসায় ডাকাত পড়েনি।

'আরে কী বলব। আমার তো চোখ বন্ধ।'

'চোখ বন্ধ হলে কথা বলা যায় না নাকি। মুখ তো আর বন্ধ না।'

'আসলে আমি এসব কথা শুনেছি তা না। এই ডায়লগগুলোই মামা-মামি দিতে পারেন বলে ধারণা করছি। মামার সাথে পরে এই নিয়ে কথাও হয়েছে। ডায়লগগুলোন এই রকমই কেবল হওয়া সম্ভব।'

'আচ্ছা বলো বলো। বলে যাও। তোমার গল্পের রসভঙ্গ আমি করতে চাই না।'

'আমি রান্না ঘরে পৌছে পানির জগ পেয়ে চোখটা ধুয়ে নেই। তারপর বাথরুমে এসে গামছা দিয়ে সমস্ত গা মাথা ভালো করে মুছি। পানি নাই কী করব?'

সীমা বলল, 'ছি ছি গোসল করলে না। গায়ের সাবান গামছা দিয়ে মুছলে!'

'হ্যাঁ মুছলাম। দিনটা ছিল খুব খারাপ। কেবল তো শুরু। আরও কত কী ঘটবে?'

'আচ্ছা বলো। পরে আর কী কী ঘটল।'

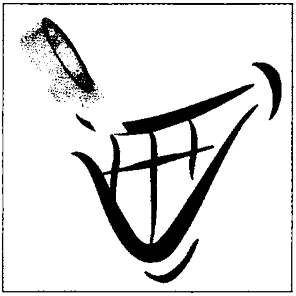

মামি ফোনে কথা বলছেন, , 'হ্যালো পুলিশ স্টেশন। আমাদের বাসায় ডাকাত পড়েছে। আমরা বেডরুমের দরজা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে ফোন করছি। জি বাড়ির ঠিকানা হলো...বাড়ি নম্বর ২২ এর এ, রোড নম্বর ৪ বাই এক, ধানমণ্ডি। জি আপনারা চলে আসুন, প্লিজ, আমাদের বাঁচান। হ্যাঁ, শওকত হোসেনের বাসা। চিনেছেন তো! জ্বি জ্বি সততা ইন্সুরেন্সের এমডি শওকত হোসেন। জ্বি প্লিজ...

সীমা বলল, তোমার মামি ফোনে পুলিশ ডাকছেন, আর তুমি কী করছ?

'আমি? আমি তৈরি হচ্ছি। কাপড়চোপড় পরছি। গেঞ্জি, প্যান্ট শার্ট। ভাবলাম একটু পারফিউম স্প্রে করলে কেমন হয়। আমি তো ছিলাম আমার মামাত ভাই তপুর রুমে। ওর ড্রেসিং রুমে দেখি একটা স্প্রে। ওটা নিয়ে যেই না স্প্রে করেছি বগল বরাবর, অমনি সাদা ফেনা বেরিয়ে আমার শার্টটাই দিল প্রায় নষ্ট করে। আসলে ওটা কোনো সুগন্ধির কৌটা ছিল না। ওটা ছিল আসলে একটা শেভিং ফোমের কৌটা।

বোঝো অবস্থা!'

'হি হি হি। তুমি এত হাসাতে পারো!' সীমার হাসি থামছে না, হাসির প্রাবল্যে তার দু চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

'আরে শোনো না। সেই শার্টের গা থেকে শেভিং ফোম সরানোর জন্যে আবার আমাকে গামছা থেরাপি প্রয়োগ করতে হলো।

আমার মোবাইলের ঘড়িতে বাজে ৭টা। মামামামি কেউ ঘুম থেকে ওঠেন নি। আমি তো আর জানি না ঘড়িতে তখন কেবল বাজে সাড়ে আড়াইটা বা পোনে তিনটা বাজে।

আমি গেলাম মামার ঘরের সামনে।

টুকটুক করে তাদের দরজায় টোকা দিলাম।

কোনো সাড়া নেই।

এখন কল্পনা করতে পারি ভেতরে মামা আর মামির অবস্থাটা। ভয়ে নিশ্চয় দুজনেই সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ ডাকাত-সর্দার কল্লোল ওরফে কাল্লু তার শোবার ঘরের দরজায় হামলে পড়েছে। এখুনি বোধ হয় দরজা ভেঙে ফেলবে। তারপর উদ্যত সঙ্গীনের মুখে চিৎকার করে বলবে, খবরদার, কেউ কোনো কথা বলবেন না। যা আছে সব দিয়ে দিন।

মামি বলবেন, জনাব ডাকাত, মে আই হ্যাভ ইয়োর ফেভার, আপনি কি অনুগ্রহ করে আপনার জুতাজোড়া বাইরে খুলে আসবেন। আর আপনার পদচ্ছাপ ও পদধূলি নিজ হাতে একটা পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলবেন। এর বিনিময়ে আপনি যা চাইবেন, তাই পাবেন। দয়া করে গুলি-টুলি করবেন না। আমার ঘরের দেয়াল নষ্ট হবে, আর বলা যায় না, গুলি কারও গায়ে লেগে গেলে মেঝেতে দেয়ালে রক্তের দাগ লেগে যেতে পারে। যাই হোক, তখন তো আর এইসব কথা মনে হয়নি। মনে একটাই চিন্তা ছিল, মামা তো দরজা খুলছেন না। আমার মোবাইলের ঘড়িতে বাজে ৭টা। মামা কখন উঠবেন, আর আমরা রওনাই বা হব কখন?

আমি ধীরে ধীরে ডাকতে লাগলাম, মামা মামা। ও মামা।

মামা বললেন, ডাকাতরা কি চলে গেছে?

আমি নিজেই ভয় পেয়ে যাই। মামা, ডাকাত এসেছিল নাকি?

মামা বলেন, তুই টের পাসনি। ঘরে যে গুলি হলো?

আমি বলি, গুলি? মামা গুলি হয়েছে? কোথায় মামা।

ভয়ে আমার সারাটা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ছোটবেলা থেকেই আমি মারামারি গণ্ডগোল বোমাগুলি হাঙ্গামা ভয় পাই।

মামা বলেন, ওরে হতভাগা, এত গোলাগুলি হলো, তুই কিছু টের পাসনি। তাহলে তুই উঠেছিস কেন?

আমি বলি, মামা, আপনাকেও তো উঠতে হবে।

মামা বলেন, কেন? উঠতে হবে কেন?

আমি বলি, আমাকে ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে না?

মামা বলেন, এই মধ্যরাতে?

আমি বলি, ৭টা তো বাজে। আপনি এখন না উঠলে তো আমরা ৮টার মধ্যে বের হতে পারব না মামা।

মামি বলেন, দেখো ঘড়িতে বাজে পোনে তিন। ও বলে ৭টা। ওই ডাকাতদের ডেকে এনেছে।

মামা বলেন, এই ডাকাতরা সব চলে গেছে?

আমি বলি, মামা, ডাকাত পড়েছিল নাকি। আমার ঘরে ঢোকে নি তো। আমি কিছুই টের পাই নি।

মামা বলেন, এই তোকে কি ওরা বন্দুকের মুখে ধরে রেখেছে?

আমি বলি, জি না মামা।

মামি বলেন, আরে বুদ্ধু। বন্দুকের মুখে ও যদি এখন থাকে তাহলে কি আর ও বলবে নাকি আমি বন্দুকের মুখে।

মামা ফিসফিসিয়ে বলেন, তাও তো কথা।

আমি বলি, মামা, ডাকাতরা মনে হয় চলে গেছে।

মামা বলেন, সত্যি গেছে?

আমি বলি, আমি তো কাউকে দেখি না মামা।

মামা বলেন, তুই তাহলে কেন বললি যে ৭টা বাজে।

আমি বলি, জি মামা ৭টাই তো বাজে।

মামি বলেন, ডাকাতরা রিভলভার ধরে ওকে বলাচ্ছে।

আমি বলি, আমার এলার্ম ৬ টায় বেজেছে। এখন বাজে ৭টা। এই যে আমার মোবাইলে।

মামা বলেন, দেয়ালঘড়িতে দেখ তো কটা বাজে?

আমি বলি, ঘড়িটা মনে হয় নষ্ট মামা। ওটাতে তো দেখি ৩টা বাজতে ৫ মিনিট বাকি।

মামা বলেন, তোর মাথা নষ্ট। ডাকাতরা যা চায় তুই দিয়ে দে।

আমি বলি, মামা, ডাকাত তো নাই। কখন এসেছিল তাও জানি না। এলেও চলে গেছে।

এত শব্দ হলো এত ভাঙচুর হলো তুই কিছুই টের পেলি না? মামা বললেন।

আমার মনে হলো, আমি বুঝেছি ডাকাত কীভাবে পড়েছিল।

বললাম, মামা কিছু শব্দ আমি করেছিলাম।

মামা বললেন, তুই শব্দ করবি কেন?

স্যরি মামা। পানি নাই তো। গোসল করতে গিয়ে চোখেমুখে সাবান দিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। চোখ বন্ধ করে পানির খোঁজে বেরিয়েছিলাম। হাতড়াতে গিয়ে দুটো ফুলদানি ভেঙেছি।

মামি যেন এই মাত্র বিধবা হওয়ার খবর পেলেন, ডুকরে উঠলেন, ফুলদানি ভেঙে ফেলেছে.... আমার ফুলদানি ভেঙে ফেলেছে...এর চেয়ে

আমাকে ডাকাতেরা খুন করে ফেললেও আমি খুশি হবো। ওগো ওঠো... চলো দরজা খোলো...

মামির মৃত্যুভয় কেটে গেছে। ফুলদানির শোকের গাছে নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ।

মামা আলগোছে দরজা খুলে দরজার ফাঁক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন পরিস্থিতি।

পরিস্থিতি ততটা সন্দেহজনক বলে মনে হলো না। বাইরের কোনো লোকজনের উপস্থিতি তার চোখে পড়ল না। বরং আমাকে তিনি দেখলেন শার্টপ্যান্ট জুতা পরে বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি।

মামি উঁকি দিলেন, বললেন, কী করেছে সমস্ত ঘরদোর। হায় হায় আমার ফুলদানি....

আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললাম, বাথরুমে পানি নাই মামি। সাবান মেখে দেখি পানি নাই...

মামা বললেন, এত রাতে তোমার গোসল করার দরকার পড়ল কেন?

আমি বলি, ৭টা তো বেজে গেছে মামা!

মামা বললেন, পাগল কী বলে। দেখ ঘড়িতে কয়টা বাজে।

আমি বললাম, আমার মোবাইলে যে এলার্ম বাজল। ছয়টায় এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম।

মামা বললেন, দেখি। না, তোর মোবাইলের ফোনের টাইম তো ঠিক নাই।

আমার তখন মনে হলো ঘটনা কী। বললাম, বুঝেছি। ব্যাটারি খুলে ফেলেছিলাম তো একবার। তারপর আর টাইম ঠিক করা হয় নাই।

মামি তার ফুলদানির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এরই মধ্যে সাবান পানি সমেত আমি পুরো ডাইনিং স্পেসে অনেক হাঁটাহাঁটি করেছি। মেঝে সাবান-পানিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

তিনি সেই সাবান পানিতে পা রাখলেন। এবং নিয়তির নির্মম পরিহাসের শিকার হলেন। তিনি ধপাস করে পড়ে গেলেন। চিৎ হয়ে পড়ে তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন।

মামা তার শিয়রের কাছে বসলেন। আর আমার উদ্দেশে বললেন, দাঁড়িয়ে কী দেখছিস। যা পানি আন। মামীর মাথায় ঢালতে হবে।

আমি বললাম, পানি তো নাই মামা। জগে যা ছিল আমি ব্যবহার করে ফেলেছি।

মামা বললেন, ফ্রিজের বোতলে আছে। যা নিয়ে আয়।

আমি দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরে, ফ্রিজ খুললাম। একটা সেভেন আপের প্লাস্টিকের বড় বোতল নিয়ে এলাম।

মামা বললেন, দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ঢাল।

মামাও ঢালতে বললেন। আমিও ঢালতে লাগলাম।

কিন্তু বোতলে যে পানি ছিল না, সেভেন আপ ছিল সেটা তো আর আমার জানা ছিল না। বড়লোকের ফ্রিজের নিয়ম কানুন কি আর আমি জানি নাকি। জানার কথা মামার। মামা তো বললেন, ঢাল।

আমি তার মাথায় সেভেন আপ ঢালছি।

মামির মাথা বেয়ে সেটা মুখে গেল। তিনি কোল্ডড্রিংসের স্বাদ পেয়ে জেগে উঠলেন।'

সীমা হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। উফ। তুমি এত মজার কেন? বাবারে হাসাতে হাসাতে আমার পেটে খিল ধরিয়েছে। উফ। যা। মাথায় কেউ কোল্ড ডিংস ঢালে।

কল্লোল বলল, বললাম না ওইটা ছিল ভুলের দিন। ওই দিন সব কিছুতেই ভুল হচ্ছিল।

'তারপর কী হলো?' হাসির গমক কিছুটা কমলে সীমা জিজ্ঞেস করল।

কল্লোল বলল, আর কী হবে। মামি ঠোঁটে সেভেন আপ চাটতে চাটতে উঠে বসলেন। বললেন, আমার মাথায় কোল্ডড্রিংস ঢেলেছ তোমরা? তোমরা আমার মাথায় কোল্ডডিংকস ঢেলেছ!

মামা বললেন, কোল্ড ড্রিংকস নাকি?

মামি বললেন, কোল্ড ড্রিংকস নাতো কী?

মামা বললেন, কোল্ড তো হবেই। কারণ ফ্রিজে ছিল। ড্রিংকস মানে পানিও তো একটা ড্রিংক। তবে...

মামি বললেন, তুমি খেয়ে দেখো এটা কী?

মামা বোতলটা মুখে ধরলেন। ধরেই বুঝলেন, কত বড় ভুল তিনি করে ফেলেছেন। তিনি উল্টো আমাকে বললেন, এই তোকে না বললাম পানির বোতল আনতে! এটা কি এনেছিস?

আমি বললাম, কী এনেছি। আমি নিজেও একটু সেভেন আপ টেস্ট করে দেখলাম। ভালোই তো খেতে।

মামি উঠে বসলেন। মামা তাকে ধরে তুললেন। মামির কোমরে বোধ হয় ভালোই চোট লেগেছে। তিনি উহ আহ করতে লাগলেন। নিজের বাথরুমে গেলেন। ট্যাপ ছাড়লেন। পানি পড়ে না। তখন তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, তপুর বাবা। দারোয়ানকে ফোন করে পানি ছাড়তে বলো। আর গাধাটাকে বলো আবার গোসল করতে। সখিনাকে বলো ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

মামা গেলেন পিএবিক্স ইন্টারকমে দারোয়ানকে ফোন করতে। মামা গম্ভীর গলায় বললেন, এই পানি ছাড়ো তো। পানি নাই এক ফোঁটা? করো কী তোমরা?

ফোন রেখে তিনি হাঁক ছাড়লেন, সখিনা এই সখিনা...

সখিনার ঘুম ভাঙতে একটু সময় নিল।

মামা তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নক করতে লাগলেন। সখিনা উঠে এল। তার চোখে মুখে ভয় ও জিজ্ঞাসা। ঘটনা কী? এই মধ্যরাতে এই বাসায় কী ঘটেছে?

মামা বললেন, দেখ তো, কী সব ভেঙেছে। সব পরিষ্কার কর। যা স্যান্ডেল পরে আয়। পা কাটা যাবে।

সখিনা চোখ রগড়ে তার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে লেগে পড়ল বটে।

ট্যাপ থেকে পানি পড়তে শুরু করল। আমাকে আবার গোসল করতে ঢুকতে হলো। কেবল বাজে ৩টা ১০, আমার যাত্রা ৭টায়। কী করব? অসম্পূর্ণ গোসলটা সম্পূর্ণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে গণ্য হবে।

বাথরুমে ঢুকে ভাবলাম, মানুষ তিনভাবে শেখে। দেখে শেখে, ঠেকে শেখে ও ঠকে শেখে। এর আগের বার আমি ঠকেছি। চোখে-মুখে সাবানের ফেনা লাগানোর পরে পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েছি। কিন্তু এইবার আমি আর তা হতে দিচ্ছি না। প্রথমেই পানি সঞ্চয় করে রাখতে হবে। বাথরুমে একটা বালতি ছিল। বালতিতে একটু সাবান পানি দেখা যাচ্ছে। সেটা ফেলে দেওয়া দরকার। বালতিটা ধরে পানিটা ঢেলে দিলাম কমোডে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত্রি হয়।

মামীর সদ্য নষ্ট হওয়া শাড়িটা বাথরুমে বালতিতে ভিজিয়ে রেখেছিল কাজের মেয়েটি। তাতো আর আমি জানতাম না।

পানির সাথে সাথে শাড়িটাও কমোডে চলে গেল। তার অর্ধেকটা ভেতরে ঢুকে গেছে, অর্ধেকটা রয়ে গেছে বাইরে। এখন আমি কী করি?'

সীমা হাসতে হাসতে এবার আভিধানিক অর্থেই মাটিতে গড়িয়ে ফেলল। ও মা, ও মা গো, বলে সে হাসি সামলানোর চেষ্টা করছে। চোখে পানি। এত প্রবল বেগে হাসির ঝড় বইতে আর কেউ কোনোদিনই দেখেছে কিনা সন্দেহ।

'তারপর কী করলা?' সীমা জিজ্ঞেস করে।

তারপর আর কী করব? যার শাড়ি সেই সামলাক, এই মহান স্লোগান বুকে ও মুখে ধারণ করে আমি গোসল সারতে লাগলাম।

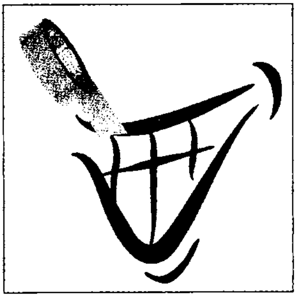

গোসল সেরে আমি ঘরে গেলাম। আবার কাপড়চোপড় পরতে হবে। তবে এখনই পরব না। সকাল হতে এখনও ঢের বাকি। ৪টাও বাজে না। কী করা যায়, ভাবছি।

কান খাড়া করলাম।

আম্মা আম্মা দেইখা যান। সখিনার গলা।

'এই তুই এখানে এসে বল। চিল্লাস কেন?' মামির কণ্ঠস্বর।

'বাথরুমে আইসা দেখেন। পাগলা বেটা কী করছে।'

মামি বলেন, কী?

'আপনের শাড়ি কোমডে ফেইলা দিছে।'

'কী বলিস? চল তো দেখি।'

আমি এ ঘরে বসে প্রমাদ গুনছি। আর ওরা, ডুবন্ত, অনন্ত পাতালের দিকে গমনরত শাড়ি সরেজমিনে দেখে তারা ফিরছেন।

মামি বলছেন, তপুর বাবা। এখনই যদি তুমি এই লক্ষ্মীছাড়া ছোড়াকে বাড়ি থেকে বের করে না দিচ্ছ তাহলে আমিই নিজেই সকাল হলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব।

উত্তম প্রস্তাব। আশা করি, মামা আমাকে এখনই বের করে দেবেন না, আর মামিও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। সকাল হলে তিনিই বের হয়ে চলে যাবেন। তিনি যদি বের হয়ে যান, এই পৃথিবী পবিত্র হয়ে উঠবে। কারণ তিনি হচ্ছেন একজন সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী। তিনি যখন যেখানে যাবেন, সেই জায়গাটাকে করে তুলবেন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র। কাজেই তার গান বা শ্লোগান হওয়া উচিত, পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়, খুলে দাও প্রিয় খুলে দাও বাহুডোর (বা গৃহদোর)।

কমোডস্থ ওই শাড়িটা কী করা হবে, তাই নিয়ে ওই রুমে গবেষণা চলছে। এটাকে অবশ্যই বের করা হবে, তারপর কী করা হবে? মামি বলছেন

ওটাকে সাবধানে তোল। তারপর ওই ঝুড়িটাতে রাখ। ঝুড়িসমেত ওটা ফেলে দে।

সখিনা বলছে, আম্মা। ধুইয়া ফেলাইলেই তো হয়। ধুইলেই তো ময়লা সাফ। দরকার হইলে ডেটল দিয়া ধুই।

মামি বলছেন, প্রশ্নই আসে না। এই শাড়ির কোনো চিহ্নও আমি এই বাড়িতে দেখতে চাই না।

সখিনা বলছে, আম্মা, আপনে না পরলেন। আপনার ছেলের বউ পরতে পারে।

ছেলের বউ? মামির মনে হয় এই আইডিয়াটা পছন্দ হলো। কমোডে পড়া শাড়ি ছেলের বউকে দিয়ে দেওয়া যায়। তপু ভাইয়ার এখনও বিয়ে হয়নি। তবে হবে তো কোনো একদিন। তার আদরের একমাত্র সন্তানকে কেউ না কেউ তো ছিনিয়ে নিয়ে যাবেই তার কাছ থেকে। তাকে দেওয়ার জন্যে এটা হতে পারে একটা উত্তম উপহার নিশ্চয়ই মামি ভাবছেন।'

'কক্ষনো না।' সীমা বলে।

কল্লোল বলে, 'আরে সব শাশুড়িই মনে মনে পুত্রবধূকে অপছন্দ করে। কেউ বলে। কেউ বলে না।'

'তুমি কীভাবে সেইটা জানো। তুমি কি শাশুড়ি হয়েছ? হলেও কি তুমি কি সব শাশুড়ির মনের কথা জানো।'

'আচ্ছা সব শাশুড়ি তার পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের চেয়েও পছন্দ করে। তোমার দুর্ভাগ্য যে, তোমার কোনো শাশুড়ি থাকবে না। ছাত্রজীবনটা কত খারাপ হতো, যদি পরীক্ষা ব্যাপারটা না থাকত। তোমার বিবাহিত জীবনটাও তেমনি হবে, কারণ তোমার কোনো শাশুড়ি থাকবে না। তুমি সেই শোকে এখনই কাঁদো।'

'কাঁদবই তো।'

'বেশি কাঁদতে হবে না। শাশুড়ি না থাকলেও তোমার একটা মামি শাশুড়ি থাকবেন। আমি তার হাতেই তোমাকে তুলে দেব।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না।'

'এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা। আর তুমি বুদ্ধির পরিচয়টা যাতে ঠিকমতো দাও, সেই জন্য তোমাকে পুরো গল্পটা আমি সবিস্তারে শোনাচ্ছি।'

'আচ্ছা বলো। তারপরে কী হলো?'

'তারপরে!

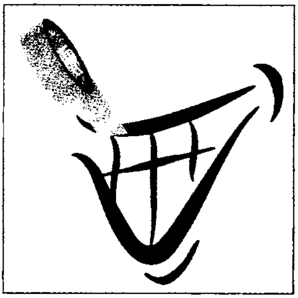

তারপর বাড়ির ইন্টারকম ফোনটা বেজে উঠল। গেট থেকে দারোয়ান ফোন করেছে। সখিনা ধরল। হ্যালো বলার পরে সে

হ্যালো বলেই সে হা হয়ে গেল। এখন তার মুখে মশামাছি তো বটেই, একটা চড়ুই পাখিও যদি ঢুকে যায়, সে টের পাবে না।

মামি বললেন, এই সখিনা কী হয়েছে?

সখিনা তোতলাতে লাগল, পু পু পু...

মামি ধমক দিয়ে বললেন, কী পু পু করছিস।

সখিনা বলল, পু পু পু...

মামি ফোনটা কেড়ে নিয়ে বললেন, হ্যালো, কী?

ও পাশ থেকে কী বলল, তাতো আর আমি শুনিনি। এরপর দেখলাম মামিও হা হয়ে গেলেন।

মামা বললেন, কী?

মামি বললেন, এখন কী হবে?

মামা বললেন, ঘটনা কী?

মামি বললেন, ঘটনা হলো ওরা এসেছেন।

মামা বললেন, কারা?

ওরা।

ওরা কারা?

পু পু পু...

তোমরা খালি পু পু পু করে পুলিশের মতো বাঁশি বাজাচ্ছ কেন?

পুলিশই এসেছে।

কেন?

কেন আবার? ফোন করে আসতে বললে না!

মামা বললেন, তাই তো। ফোন করে আসতে বলেছ তো তুমি। এসেছে। ফিরে যাবে।

মামা ফোন ধরলেন। বললেন, হ্যালো, আসলে আমাদের বাসায় ডাকাত পড়েনি। আমরা একটু ভুল বুঝেছিলাম। আপনারা চলে যান।

পুলিশ ওপাশ থেকে কী বলল, আমরা শুনতে পেলাম না। মামা বললেন, আচ্ছা আসুন।

মামি জিজ্ঞেস করলেন, কী বলল পুলিশ। আবার আসতে বললে কেন? জুতা পায়ে আমার বাড়িতে ঢুকবে নাকি? এই মাত্র ঘরদোর সব মোছালাম।

মামা বললেন, আমি আপনার কথা মানছি। তবু আপনার বাসা আমাদের সার্চ করতে হবে। এমন যদি হয়, আপনি ডাকাতের গান পয়েন্টে ফোন ধরেছেন। ডাকাত আপনাকে বলছে যে, বলেন, আমরা চলে গেছি। বন্দুকের ভয়ে আপনি সেটা আমাদের বলছেন। আমরা অবশ্যই আপনার বাড়িতে ঢুকব।

তুমি কী বললে? মামি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি কী বললাম, সেটা তো তুমি শুনলেই আসতে বললাম।

কেন তুমি আসতে বললে! পুলিশেরা একই জুতা পরে সব জায়গায় ডিউটি করে, কত ক্রিমিনালদের আখড়ায় যায়, সব নোংরা ময়লা তাদের জুতায় লেগে আছে, সেসব পরে আমার ঘরে আসবে।

আমি কী বলব? না আসবেন না?

হ্যাঁ তাই তো বলা উচিত ছিল। মামি বললেন।

একটু পরেই বাড়ির দরজায় ধুমধাম শব্দ।

মামা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, কে?

'আমরা পুলিশ। তাড়াতাড়ি দরজা খোলেন।'

মামা এগিয়ে গেলেন। পেছনে পেছনে আমি। আমার মনে ভয়। এই বাড়িতে বাইরের লোক বলতে আমি। কাউকে না পেয়ে পুলিশ না আমাকেই ধরে নিয়ে যায়। আর মামি বলেও দিতে পারেন, এই যে দেখছেন, ঝড়ো কাকের মতো দেখতে ছেলেটা, এই হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর ডাকাত, যে আমাদের বাড়িতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছে।

দরজা খোলা হলো। অস্ত্র তাক করে কয়েকজন পুলিশ ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। হ্যান্ডস আপ।

আমি সাথে সাথে দুই হাত তুললাম।

মামাও দুই হাত তুললেন।

পুলিশ বলল, কোথায় ডাকাত?

মামা বললেন, আমি লজ্জিত। ক্ষমাপ্রার্থী। আমিই এই বাড়ির মালিক। আমিই আপনাদের ফোন করেছিলাম। আসলে আমাদের একটা ভুল হয়েছিল। বাড়িতে আসলে কোনো চোর-ডাকাত আসেনি।

আপনিই যে বাড়ির মালিক, তার কোনো প্রমাণ আছে?

মামা বললেন, এই মোবাইল থেকে ফোন করেছিলাম। এই ফোন নাম্বারটা চেক করলে বুঝতে পারবেন।

পুলিশ বলল, আপনারা যে ভয়ে বলছেন না, চাপে পড়ে বলছেন না, যে বাড়িতে ডাকাত পড়েনি, সেটাই বা বুঝব কী করে? অনেক সময় ডাকাতরা বাড়ির কোনো ছেলেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রেখে বলে, বলে দিন, বাড়িতে ডাকাত পড়েনি, তা যদি না করেন, তাহলে এক্ষুণি ছেলের খুলি উড়িয়ে দেব।

মামা বললেন, না না আমাদের বাড়িতে আমরা এই চারজনই লোক। আমি, আমার স্ত্রী, আমার মেইড আর আমার ভাগ্নে।

পুলিশ বলল, ঠিক আছে। আমরা পুরা বাসা সার্চ করে দেখব।

তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকতে লাগল। তাদের জুতার আওয়াজ হচ্ছে খটখট।

মামি বললেন, শোনেন। সার্চ করেন আপত্তি নাই। আপনাদের জুতা খুলতে হবে। আমার ঘরদোরে নোংরা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আপনারা জুতা খুলে তারপর ঘরের মধ্যে ঢোকেন।

পুলিশ বলল, অ্যারেস্ট দি লেডি। আমরা জুতা খুলতে বন্দুক রেখে মাথা নিচু করব আর অমনি ওরা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অ্যারেস্ট দিস লেডি।

সঙ্গে সঙ্গে তিন পুলিশ মামিকে ধরে তার হাত পেছন থেকে বেঁধে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল।

মামি বললেন, ডোন্ট টাচ মি। প্লিজ। আমার গায়ে হাত দেয়ার আগে ডেটল সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আসেন। প্লিজ...

পুলিশ সমস্ত বাড়িঘর তছনছ করে ডাকাত খুঁজছে। পুলিশের একেকটা পদক্ষেপ যেন মামির বুকে একেকটা ডাস্টবিনের সমস্ত ময়লা হয়ে বর্ষিত হচ্ছে।

পুলিশ তাদের শোবার ঘরে। পায়ে বুট জুতা।

পুলিশ তাদের বাথরুমে ঢুকল। পরনে বুট জুতা।

পুলিশ বাকি দুই ঘরে গেল। পরনে বুট জুতা। তারা খাটের নিচে উঁকি দিল। তারা খাটের ওপরে উঠে জানালার ভারী পর্দা সরিয়ে দেখল, তারা স্টোর রুম লক করল। তারা বারান্দায় গেল।

মোটামুটি আমার শুচিবায়ুগ্রস্ত মামির মনের ওপরে যত ধরনের নিপীড়ন করা সম্ভব, তারা তারই একটা চূড়ান্ত মহড়া করে ফেলল। সবটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন তারা কিছুই পেল না, তখন তারা বলল, কিছুই তো নাই। হেই মিয়া আপনেরা এত রাতে পুলিশকে হয়রানি করছেন ক্যা?

মামা বললেন, আমি তো আপনাদের বলেইছি, আমরা ভুল করে আপনাদের কল দিয়েছিলাম। আপনারাই তো শুনলেন না।

পুলিশ বলল, পুলিশের সঙ্গে তো আপনারা ফাজলামো করতে পারেন না। আপনাদের বিরুদ্ধে আমি একটা নোট দিয়ে দেব। আপনাদের নামে একটা ফাইল খোলা হবে। আসি।

পুলিশ চলে গেল। মামা গিয়ে মামির হাতের বাঁধন খুলে দিলেন।

মামি বললেন, আমি এই বাড়িতে আর থাকব না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। এই বাসার মতো নোংরা বাসা আর কোথাও আমি দেখি নাই। আমি এই বাসায় আর এক মুহূর্ত থাকলে মরেই যাব।

মামা বললেন, কোথাও যাবার আগে তো তোমার নিজেকে পরিষ্কার করতে হবে। পুলিশ তাদের হাত দিয়ে তোমাকে বেঁধেছিল। বোঝো। তোমার হাতে কত নোংরা লেগেছে।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মামি দৌড়ে তার ঘরে চলে গেলেন। প্রথমে ডাকলেন সখিনাকে। বললেন, বাথরুমটা ভালো করে পরিষ্কার কর।

সখিনা তার বাথরুম পরিষ্কার করল। তারপর মামি বাথরুমে গেলেন। নিজেকে পরিষ্কার করতে।

আর এদিকে সখিনা সবগুলো ঘরদোর বিছানা ঠিকঠাক করল। মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করল। ততক্ষণে সাড়ে চারটা বেজে গেছে।

মামি বেরিয়ে এসে কপাল চাপড়াচ্ছেন। আমার সাজানো বাগান তছনছ করে ফেলল কোথাকার একটা বাঁদর এসে। আমার সব শেষ হয়ে গেল। আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই।

আমি মাটির সাথে মিশে যাচ্ছি। আসলেই তো আমার জন্যেই মামির ওপর দিয়ে এই ঝড়টা বয়ে গেল। আমি কেন এত রাতে ঘুম থেকে উঠতে গেলাম। ইস। কেন যে আমার মোবাইল ফোনটা অসময়ে এলার্মটা বাজাল। কেন যে আমার মোবাইলটার ব্যাটারি আমি খুলতে গেছলাম।

আমার কান্না পাচ্ছে। কী করে যে আমি মামির চিত্তটা একটু জয় করতে পারি। তার মনের কোণে একটু জায়গা দখল করে নিতে পারি। আমার অবস্থা ছুটি গল্পের ফটিকের চেয়েও খারাপ।

মামাও বসে আছেন হতভম্বের মতো। একটা রাতে তার প্রিয় ভাগ্নেকে নিজের বাড়িতে রেখে তিনি কত বড় ভুলটাই না করেছেন, হয়তো তিনি তাই ভাবছেন।

মামার মুখের দিকে তাকিয়েও আমার খুবই অপরাধবোধ হচ্ছে।

আসলেই এই রকম যার পরিচ্ছন্নতার বাতিক, তার বাড়ির ওপর দিয়েই কেন এই রকম একটা ঝড় বয়ে যাবে?

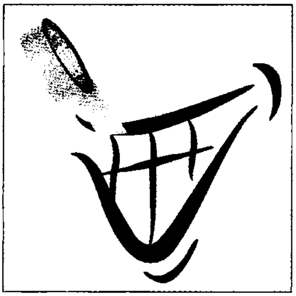

সীমার মুখটাও দুঃখ দুঃখ হয়ে গেল। সে বলল, ইস, আগে থেকে যদি তোমার সাথে আমার পরিচয় থাকত, তোমাকে তো আমি আমাদের বাসাতেই থাকতে দিতাম।

কল্লোল বলল, তা কী করে হবে। আমি মামার বাসায় উঠব। তুমি তাদের পাশের বাসায় থাকো। সেখানেই না আমাদের পরিচয় হবে।

তা তো বাস্তবে হয়েছে। কিন্তু তোমার মামার বাড়িতে উঠে তোমাকে যে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে, এই গল্প শুনতে আমার ভালো লাগছে না। তুমি না আমাকে বললা তুমি একটা হাসির গল্প শোনাবা?

আরে হাসির পরে কান্না, বলে গেছেন রাকেশ খান্না।

না। আমি কাঁদতে চাই না।

আচ্ছা তাহলে বলি, কান্নার পরে হাসি, বলে গেছেন বিনয় বাঁশি।

বিনয় বাঁশিটা কে?

'চেনো না। ওই যে ঢোল বাজিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। বাদ দাও। হাসির সাথে আমি আরেকটা মিল দিতে পারব, কান্নার পরে হাসি, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

সীমার মুখে তবুও বিষাদের ছায়া। সে বলল, মামার বাড়িতে তোমাকে এতটা অপদস্থ হতে হয়েছিল।

কল্লোল বলল, আরে আমাকে আর কী অপদস্থ হতে হয়েছে। আসল অপদস্থ তো হয়েছেন মামি নিজে।

তাও অবশ্য ঠিক। আচ্ছা বলো তারপর কী হলো?

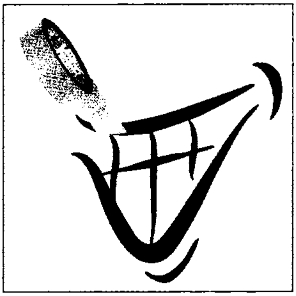

'তারপর? শোনো, ডেঞ্জার ডাজ নট কাম এলোন। বিপদ কখনও একা আসে না। এরপরেও বিপদ এসে গেল।'

'আবার বিপদ? তুমি ডেকে আনলে?'

'আমি না। আমার অদৃষ্ট।'

'কী বিপদ ডেকে আনল তোমার অদৃষ্ট।'

'একটা বিড়াল।'

'বিড়াল। হ্যাঁ। একটা নিরীহ কালো রঙের বিড়াল। চতুষ্পদ প্রাণী। মিউ মিউ করে ডাকে। দুধ মাছ খেতে ভালোবাসে। সে খুবই আরামপ্রিয়। মানুষের বিছানায় ঘুমায়।'

'বিড়ালের একটা লেজও আছে। তাকে বাঘের মাসী বলা হয়। এ সবই আমি জানি। বিড়াল তোমার জীবনে কী বিপদ ডেকে আনল, সেই কথাটা বলো।'

'আমার জীবনে না তো! আমার মামির জীবনে।'

'তোমার মামির জীবনে বিড়াল কী ঘটাল? বলো।'

'সে এক কাহিনী।'

'মামি যখন তার বাড়ির শুচিতাহানির দুঃখে পাগলপ্রায়, তবে শোক বেশি হওয়ায় তিনি পাথর বনে গেছেন, সেই সময়ে কোত্থেকে এক বিড়াল এসে ডেকে উঠল মিউ।

মামির সমস্ত দুঃখ শোক স্তব্ধতা মুহূর্তে পরিণত হলো আতঙ্কে।'

'কেন?' সীমার চোখে মুখে বিস্ময়।

'কারণ মামি বিড়াল ভয় পান!'

'যা বিড়াল কেউ ভয় পায়।'

'জানি না আর কেউ পায় কিনা। আমার মামি বিড়াল ভয় পান। শুনেছি নেপোলিয়নও নাকি বিড়াল ভয় পেতেন। মানুষের একেকজনের একেক

ফোবিয়া থাকে। কেউ আরশোলা ভয় পায়, কেউ মাকড়সা ভয় পায়, কেউ উঁচু জায়গায় ভয় পায়। শুনেছি মাও সে তুং উচ্চতায় ভয় পেতেন। কোনোদিনও প্লেনে চড়েননি। তুমি কিসে ভয় পাও, সীমা?'

'আমি। সাপ খুব ভয় পাই।'

'আমি একদম সাপ ভয় পাই না। ছোটবেলায় গ্রামে ছিলাম তো। জ্যান্ত সাপের লেজ ধরে কত ঘুরিয়েছি।'

'কী বলো?'

'এই তোমার পায়ের নিচে এটা কী?' বলেই কল্লোল পা তুলে ফেলে।

'উরে মারে' বলে সীমা জড়িয়ে ধরে কল্লোলকে। কল্লোলও এই সুযোগই খুঁজছিল। আশ্রয় দেয় সীমাকে।

'থাকো থাকো। ভালোই তো লাগছে', কল্লোল বলল।

সীমা বলল, আমি আর এখানে বসতে পারব না। আমার সাপের ভয় লাগছে। কেন তুমি বললা?

আচ্ছা চলো তাহলে আমরা ওই বাঁধানো জায়গাটায় গিয়ে বসি। ওখানে আশা করি সাপখোপ আসবে না।

কল্লোল আর সীমা একটা শান বাঁধানো জায়গায় গিয়ে বসল।

সীমা বলল, আচ্ছা তোমার গল্পটা এখন শুরু করো।

ও গল্প। কোথায় যেন আছি?

ওই যে বাড়িতে বিড়াল এল। বিড়াল ডেকে উঠল মিউ।

রাইট। বিড়াল ডেকে উঠল মিউ। অমনি মামিও মামাকে জড়িয়ে ধরলেন। মামা বললেন, কী?

মামি ভয়ে একেবারে নীল। বললেন, বিড়াল।

মামা বললেন, বাড়িতে বিড়াল এল কোত্থেকে?

সে কি আমি জানি? আমাকে বাঁচাও।

মামা বললেন, কল্লোল বাবা। বিড়ালটাকে ধরে বাড়ি থেকে বের করে দে বাবা। তোর মামি ডাকাতের চেয়েও বিড়াল বেশি ভয় পায়।

আমি আমার কাজ পেয়ে গেলাম। এইবার যদি মামির আস্থা একটু অর্জন করতে পারি। বিড়াল প্রথম রাতেই মারতে হয়।

বিয়ের রাতেই যে বিড়াল মারতে হয় এই গল্পটা কী তুমি জানো?

না তো। সীমা মাথা নাড়ল।

আচ্ছা আগে প্রথম রাতে বিড়াল মারার গল্পটা বলে নিই। সেইটা বলার আগে ঘোড়া মারার গল্পটা করতে হবে। এক লোক বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি

ফিরছে। তো একটা ঘোড়ায় বর বউ দুজনেই চড়েছে। বুড়ো ঘোড়া। দুই দুজন একটার পিঠে চড়েছে। ঘোড়াটা ঠিক পেরে উঠছিল না।

বরের হাতে আবার একটা বন্দুক। ঘোড়াটা পথ চলতে গিয়ে একবার হোঁচট খেল। বর গুনে উঠল, এক। আরেকবার যদি এই রকম হয়, তাহলে কিন্তু গুলি করে মারব।

ঘোড়াটা একটু পরে আবার হোঁচট খেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে বর নিজে নামল। বউকে নামাল। তারপর গুলি করে মেরে ফেলল ঘোড়াটাকে।

বউ বলল, ঘোড়াটাকে না মারলে হতো না?

বর বলল, গুনতে শুরু করলাম। এক।

এরপরে আর কোনোদিনও বউটা বরের কোনো ব্যাপারে আপত্তি করেনি। প্রথম রাতে বিড়াল মারার ব্যাপারটাও তাই। বাসর ঘরে বিড়াল ঢুকেছে। মিউ করে একবার ডেকেছে। বর বলল, আমার কোনো ব্যাপারে আমি ইন্টারফেয়ার পছন্দ করি না। এই বিড়াল আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওকে মরতেই হবে। ব্যাস, বন্দুক বের করে বিড়ালটাকে গুলি করে মেরে ফেলল বর।

এই তুমি আমাকে এইসব গল্প শোনাচ্ছ কেন?

কারণ তুমি জানো আমি কত বড় বীর। মাস্তানের চেয়েও বড় মাস্তান। আমি কীভাবে প্রথম রাতেই বিড়াল মারলাম, সেই গল্পটা তুমি শুনবে না?

শুনব। বলো। সীমা আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইল কল্লোলের মুখের দিকে।

এইবার আমার বীরত্ব আমাকে প্রমাণ করতে হবে। কীভাবে করা যায়। আমি তাকিয়ে দেখলাম বিড়ালটা একটা শোকেসের ওপরে চুপচাপ বসে আছে। কালো রঙের বিড়াল। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

আমি বললাম, মামা, বিড়ালটাকে তাড়াতে হবে। বাসায় কী আছে? বন্দুক?

না নাই। বন্দুক টন্দুক নাই।

লাঠি?

না। লাঠিও তো নাই মনে হয়।

হকিস্টিক।

হকিস্টিক নাই। তবে একটা ক্রিকেট ব্যাট আছে।

ক্রিকেট ব্যাট হলেই চলবে। ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে ছক্কা পেটানো গেলে বিড়ালও পেটানো সম্ভব।

আমি বললাম, মামা ব্যাটটা কোথায় আছে।

মামা মামিকে বিড়ালের হাত থেকে আড়াল করে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই যে খাটটায় ছিলি সেইটার নিচেই তো থাকার কথা। দেখ তো।

খাটের নিচে ক্রিকেট ব্যাট পাওয়া গেল। জীবনেও ক্রিকেট ব্যাট হাতে ধরিনি। ছোটবেলায় যা খেলেছি সেসব সত্যিকারের ব্যাট ছিল না। কাঠের তক্তা কেটে হাতে বানানো ব্যাট। এইবার একটা বেশ দামি ব্যাট হাতে তুলে নিয়ে নিজেকে শচীন তেন্ডুলকার বলে মনে হলো। মনে মনে বিড়বিড় করলাম, হে বিড়াল, হে মার্জার, তুমিই আমার ক্রিকেট বল, এবার তোমাকেই আমি পিটিয়ে বাউন্ডারি পার করব।

কিন্তু সবকিছুর জন্যেই লাগে অভিজ্ঞতা, আর প্রশিক্ষণ। ব্যাট তো আমি ঠিকভাবে চালাতে পারি না। বিড়ালের মাথা বরাবর ব্যাট চালাই, আর সেটা গিয়ে লাগে একটা শো পিসে, শো কেসের কাচে, ঝনঝন শব্দ করে একেকটা জিনিস ভেঙে যায়।

মামা বলেন, বাবা কল্লোল সাবধানে চালা। তোর মামির সবকিছুই তো ভেঙে ফেলছিস।

মামি বলেন, আরে রাখো তোমার জিনিস। আগে বিড়ালটাকে তাড়া। বিড়াল না গেলে আমি ফিট হয়ে যাব।

এই প্রথম মামি কোনো কাজে আমাকে উৎসাহ জোগালেন। আমিও ভীষণ অনুপ্রাণিত বোধ করতে লাগলাম।

বিড়ালটাকে আমি এমন শিক্ষা দেব, আর কোনোদিনও সে এই বাড়িমুখো হবে না।

আমি লাঠি হাতে ছুটে চলেছি। বিড়ালও জীবন বাঁচাতে দ্রুত জায়গা বদলাচ্ছে।

আমিও লাঠি হাতে ক্রিজ ছেড়ে বাইরে গিয়ে ছক্কা মারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এই সময় হঠাৎই বিদ্যুৎ গেল চলে।

পুরো বাড়ি অন্ধকার।

এখন কী হবে? বিড়াল মিউ মিউ করে ডেকেই চলেছে। মামি আর্তনাদ করছেন। মামা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, আরে কিছু হবে না, আমি তো

আছিই। বাবা কল্লোল, বিড়ালটাকে কোনোমতে তুই বের করে দে বাপ। তাড়াতাড়ি কর।

আমি বলি, আমি মামা বিড়ালকে ছাড়ব না। এসপার না হয় ওসপার।

বিড়ালের তো চোখ জ্বলে। অন্ধকারে বিড়ালের জ্বলন্ত চোখ দেখেই চেনা যায়।

চোখ দেখে দেখে আমি বিড়ালের পেছনে ছুটছি। ব্যাট চালাচ্ছি। যাবি কই?

ওই তো চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে। যাবে কই? আমি ব্যাট চালাই চোখদুটো লক্ষ করে।

আসলে ওটা ছিল টেলিভিশনের পর্দা। তাতেই বিড়ালের চোখ দুটো প্রতিফলিত হচ্ছিল। আমার এক এক বাড়িতে সেটা ভেঙে শত টুকরা হয়ে গেল।

হি হি হি, সীমার হাসির শব্দে এক ঝাঁক চড়ুই গেল উড়ে।

'তুমি টেলিভিশন ভেঙে ফেললে। তোমার মামির এত শখের সাজানো সংসারটাই তো তুমি তো ভাঙবে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ টেলিভিশন ভাঙলাম। তারপরে বাড়ি মারলাম সোফায়। সোফাটা তো ভাঙল না। কিন্তু শব্দ হলো। তারপর বিড়ালটা হারিয়ে গেল। ভাবলাম যাক, বিড়ালটা হয় মরেছে। নয়তো পালিয়েছে। একটু পরে আবার অন্ধকার ভেদ করে মিউ মিউ শব্দ ভেসে আসতে লাগল। ওই যে বিড়ালটা।

মামা বললেন, কল্লোল। বাবা। দরজা বন্ধ করে বিড়াল মারতে হয় না বাবা। দরজাটা খোল।

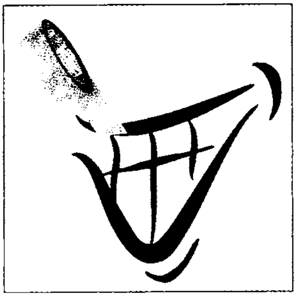

আমি অন্ধকারে পথ হাতড়ে গেটের দরজাটা খুললাম। মামা কিছুই করতে পারছেন না কারণ মামি তাকে ছাড়ছেন না।

আমি বলি, বাবা বিলাই, তুমি কই!

দেখা দাও। দেখা দাও।

বিলাই বলে, মিউ মিউ। আবার ব্যাট চালাই। ভাগ্যিস ওটা ক্রিকেট মাঠ নয়। নইলে এলোমেলো ব্যাট চালানোর ফল হিসেবে কতবার যে আমি বোল্ড আউট, কট আউট, কট বিহাইন্ড, স্টাম্পড হয়ে যেতাম।

একটু পরে দেখি বিড়ালটা বাইরে মিউ মিউ করছে।

বুঝলাম, বিড়ালটা বাইরে সিঁড়ির রেলিংয়ে গিয়ে বসল। আমিও চলে গেলাম দরজার ওপারে। হে বিড়াল, আমি তোমাকে ছাড়ব না। তুমি আমার শ্রদ্ধেয় মামিকে ভয় দেখাও, এত বড় সাহস তোমার।

রেলিংয়েই বসে আছে। চোখ জ্বলছে। লেজ নড়ছে।

আমি অন্ধকারে ব্যাট চালালাম একেবারে কভার ড্রাইভ।

লেগেছে। ঠাস করে শব্দ হলো। ধপাস করে পড়ে গেল একজন। আর্তনাদ শোনা গেল। মৃত্যুচিৎকার। তবে বিড়ালের আর্তনাদ নয়। মানুষের। কারণ শোনা যাচ্ছে, ওরে বাবা রে, মরে গেলাম রে। তারপর নীরবতা।

এই সময় বিদ্যুৎ চলে এল। আমি দেখলাম আমার চোখের সামনে সিঁড়িতে একটা লাশ পড়ে আছে। বিড়ালের নয়। মানুষের।

সীমাও আর্তনাদ করে উঠল, কী বলো, তুমি মানুষ খুন করে ফেললা?

করলামই তো মনে হচ্ছে। আমি না বীর। মানুষ না মেরে কেউ বীর হয়। দেখেছ কোনোদিনও।

কে ওই মানুষটা? কাকে মারলা? পুলিশ তোমাকে ধরল না?

এতগুলো প্রশ্ন একবারে করলে কেমন করে চলবে। একটা একটা করে প্রশ্ন করো। একটা একটা করে জবাব পাবা।

লোকটা কে?

আচ্ছা আমি সিরিয়ালি গল্পটা বলি। তুমি শুনতে থাকো।

না না। আমার খুব টেনশন হচ্ছে। আমাকে আগে বলো কাকে মারলা। লোকটা কোত্থেকে এল? খুনের দায়ে তোমার কী হলো, ফাঁসি না কারাদণ্ড?

এই জন্যেই লোকে বলে মেয়েদের ধৈর্য নাই।

মেয়েদের অবমাননা করে কথা বোলো না। জেনারেল টার্মে কোনো কথা বলতে নাই।

ওকে ওকে। আই উইথড্র। তাহলে আমি আস্তে আস্তে বলি। তুমিও আস্তে আস্তে শোনো।

আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মামার কাছে গেলাম, বললাম, মামা মামা আমি খুন করেছি। মামা মামা আমি খুন করেছি।

মামা বললেন, মেরেই ফেললি?

আমি বললাম, মেরেই ফেললাম।

মামা বললেন, বিড়াল মারলে সমান পরিমাণ নুন দান করে দিতে হয়।

আমি বললাম, বিড়াল মারি নি তো।

মামা বললেন, তাহলে কাকে মেরেছিস।?

আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম, আমি একটা মানুষ খুন করেছি।

কী বলিস, মানুষ খুন করেছিস? মামা ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন।

আমার তখন মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছিল না। আমি বললাম, জি মামা, আমি মানুষ খুন করেছি।

শুধু মামাকে নয়, মামিকেও আমার কীর্তির কথা জানানো কর্তব্য বলে মনে হলো। আমি মামির হাতে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগলাম, "মামি মামি আমি একজন মানুষকে খুন করেছি।"

মামি ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন বলে মনে হলো না। তিনি বললেন, 'বিড়ালটা গেছে?'

আমি বললাম, 'কে জানে বাবা। মানুষ মরে পড়ে আছে। বিড়ালের কথা তো ভুলেই গেছি।'

মামা বললেন, 'বিড়ালের আওয়াজ তো শুনছি না। মনে হয় বিড়ালটা ভেগে গেছে।'

মামি বললেন, মনে হয় না। শিয়োর হও। নিশ্চিত করে বলো বিড়ালটা গেছে।

মামা দরজার বাইরে উঁকি দিয়ে বললেন, এই লোকটা কে? সে এখানে মরতে এসেছিল কেন?

মামি বললেন, আবার লোককে নিয়ে চিন্তা! আমি বলি বিড়ালটা গেছে।

মামা বললেন, তা গেছে।

বিড়াল যদি যায়, তাহলে মরুক গে যে খুশি মরতে চায়। মামি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

বিদ্যুৎ আসায় ঘরের বাতিগুলো সব জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমার ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। টেলিভিশনের কাচ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে সমস্ত মেঝেতে। শো কেসের কাচ ভাঙা।

ফুলদানি শো কেসের ভাঙা টুকরা এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

মামি বললেন, সখিনা সখিনা, ঘরদোর পরিষ্কার কর।

মামা বললেন, একটা লাশ যে পড়ে আছে আমার সিঁড়ির গোড়ায়, সেটা কে পরিষ্কার করবে।

এতক্ষণে মামির বিড়ালভীতি চলে গেছে, তিনি বাস্তবতাবোধ ফিরে পাচ্ছেন। বলো কী, আমার ঘরের দরজায় মানুষের লাশ। হায় হায়, এই নোংরা জিনিস আমাকে সহ্য করতে হবে? পরিষ্কার করো। লাশটা সরাও। বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসো।

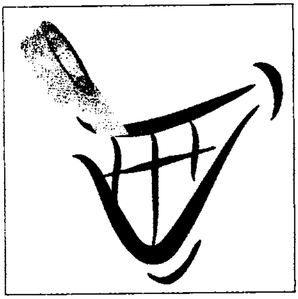

সীমা বলল, এখনও কিন্তু তুমি বলছ না যে লাশটা কার?

কল্লোল বলল, জান সোনা, একটু আস্তে আস্তে বলি।

'মামা আবার ফোন হাতে তুলে নিলেন। 'হ্যালো পুলিশ স্টেশন। জি আমি শওকত হোসেন বলছি। একটু আগে আমার বাসায় আপনারা এসেছিলেন। আমার ভাগ্নে কথা বলবে। কথা বলেন।'

মামা ফোনটা আমার হাতে দিয়ে দিলেন। আমি বললাম, 'হ্যালো আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

'ভাইয়া একটু আগে আপনারা ধানমণ্ডি ৪ নম্বরের যে বাড়িটাতে এসেছিলেন আমি সেই বাড়ি থেকেই বলছি। আমি একজনকে খুন করেছি। আপনারা কাইন্ডলি চলে আসুন। এসে আমাকে অ্যারেস্ট করুন।

ও পাশ থেকে পুলিশ বলল, ফাজলামো পেয়েছেন। একটু আগেই আমরা আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে গেলাম। আবার যাব।

আমাদেরকে বোকা পেয়েছেন?

নানা। বিশ্বাস করুন। সত্যি বলছি। এখানে একটা মার্ডার হয়েছে।

ভাই। আপনি কি বুঝছেন পুলিশের সাথে ফাজলামো করার পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে?

'হ্যালো। স্যার বিশ্বাস করুন। আমি নিজ হাতে মার্ডার করেছি। আমাকে কাইন্ডলি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান।

কাকে মার্ডার করেছেন?

তাতো জানি না। একটা লোককে। ইনফ্যাক্ট... একটা বিড়াল ছিল সব ঘটনার মূলে।

আরেকটা কথা বললে আমরা সত্যি সত্যি যাবো, আর সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসব।

তাই আসুন। প্লিজ।

খটাস করে ফোন রেখে দিল। এখন কী হবে? কী করব?

লাশটা গুম করব?

আমরা আবার ডায়াল করি। হ্যালো, পুলিশ স্টেশন। ভাই আসুন না প্লিজ। একটা মার্ডার হয়ে যাওয়ার পরেও আসবেন না।

তখন শুনতে পাই পুলিশ অফিসার কেউ কাউকে আদেশ করছেন, এই যাও তো ওই বাড়িটাতে। সবগুলোকে বেঁধে নিয়ে আসো।

পুলিশের ভ্যান আসে, বাড়ির সামনে থামে টের পাই।

তারা প্রথমে গার্ডটাকে বাঁধে। তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ওপরে আনে।

লাশটা পড়ে ছিল ছাদে ওঠার সিঁড়িতে। পুলিশের চোখে সেটা পড়ে না। তারা আমাদের দরজায় নক করে বলে, আজ সবগুলোকে বাঁধব। পুলিশের সঙ্গে ইয়ারকি।

আমি এগিয়ে যাই। বলি, আমি খুন করেছি স্যার। আমার মামা মামির কোনোই দোষ নাই। সব দোষ আমার। আমি ব্যাট হাতে বিড়াল ভেবে একটা মানুষের মাথায় মেরেছি।

পুলিশ অফিসার ক্রোধে যেন ফেটে পড়ছে, অ্যারেস্ট হিম।

আমি হাত বাড়িয়ে দেই।

বলি, স্যার লাশটা দেখবেন না?

পুলিশ বলে, সত্যি কি লাশ পড়েছে?

আমি বলি, তা না হলে এই ভোররাতে আপনাদের আমরা জ্বালাব কেন স্যার।

পুলিশ লাশের কাছে যায়। লাশের মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছিল। সোজা করে ধরে।

লাশটা উঠে বসে। বলে, আমি কোথায়?

দুজন পুলিশ ওরে বাবারে ভূতরে বলে সরে যায়।

লাশটা এখন বসে আছে। সে বলে, স্যার। আমাকে কি আপনেরা পাকড়াও কইরা আনছেন। এইটা কুন থানা?

পুলিশ অফিসার বলে, এই তুই...

লাশ বলে আমিই কানকাটা কাশেইমা স্যার।

পুলিশ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বন্দুক ধরে বলে, হ্যান্ডস আপ। এইটা তো কুখ্যাত সন্ত্রাসী মোস্ট ওয়ান্টেড কানকাটা কাশেইমা। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

পুলিশ তার হাতে হাতকড়া পরায়।

সীমা বলে ওঠে, উফ। তুমি পারোও। এতক্ষণ লাশ খুন এইসব বলে বলে আমাকে কী দুশ্চিন্তাতেই না তুমি ফেলে দিয়েছিলে।

আরে তুমি দুশ্চিন্তা করছ কেন? মার্ডার করে ফেললে তো আমি এতক্ষণ থাকতাম জেলখানায়। তোমার পাশে আসতে পারতাম নাকি! কল্লোল বলে।

তবুও টেনশন হয় না! সীমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

হ্যাঁ। টেনশন তো হবেই। কারণ তুমি তো আমাকে ভালোবাসো।

তোমাকে বলছে?

আচ্ছা তুমি আমাকে ভালোবাসো না। খারাপ বাসো।

বাসিই তো। তারপর? তারপর কী হলো?

তারপর পুলিশ কানকাটা কাশেমকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় থানায়।

পুলিশ বলে, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনারা যে দেশ ও মানুষের কত বড় উপকার করলেন।

আমি আর মামা মুখ চাওয়াচায়ি করি।

পুলিশ খুবই ব্যস্ত। তারা অয়্যারলেস ফোনে নানা জনের সঙ্গে কথা বলছে। স্যার, সাংঘাতিক ঘটনা তো ঘটে গেছে স্যার। একজন বীর যুবক কানকাটা কাশেইম্যাকে পিটিয়ে আধামরা করে আমাদেরকে খবর দিয়ে এনেছে। ইয়েস স্যার। এই বীরের নাম স্যার, এই যে স্যার আপনার নাম কী?

আমাকে বলছে? আমাকে স্যার বলে ডাকছে? আমি বলি, আমার নাম কাজি ইমদাদুল হক। ওরফে কল্লোল।

পুলিশ বলে, স্যার ওনার নাম কাজি ইমদাদুল হক ওরফে কল্লোল স্যার। স্যার আরও ফোর্স পাঠান স্যার।

মামার বাসার সামনে পুলিশ, স্পেশাল ফোর্স, র‍্যাব এসে হাজির হয়। পুরো বাসা ঘিরে ফেলে। টেলিভিশন সাংবাদিকদের ক্যামেরা আসে।

ক্যামেরা রেডি হওয়ার পরে কানকাটা কাশেইম্যাকে কোমরে দড়ি বেঁধে গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে বাসা থেকে বের করা হয়।

টিভির সাংবাদিকেরা আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে আমাকে ঘিরে ধরে। মামির ড্রয়িং রুম আবারও জুতার ধূলিতে ধূলিময় হয়ে যায়।

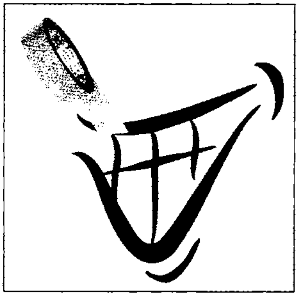

অনেকগুলো ক্যামেরা একসঙ্গে অন করা হয়েছে। ক্যামেরার মাইক্রোফোন সব আমার সামনের টেবিলে রাখা। ফ্লাশ লাইট ধরে রাখা হয়েছে আমার সামনে। যেন আমি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছি।

একজন সাংবাদিক বলে, এই সেই কানকাটা কাশেইম্যা, যাকে জীবিত বা মৃত ধরে দেওয়ার জন্যে পুলিশ ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। তাকে নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে যিনি জাপ্টে ধরেছিলেন, তিনি এক দেশপ্রেমিক সাহসী বীর যুবক।

আপনার নাম? সাংবাদিকেরা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়।

(আমাকে বলছে? সহজ প্রশ্ন। উত্তরটা আমার জানা। আমি বলি,) আমার নাম কাজি ইমদাদুল হক কল্লোল।

আচ্ছা আপনি যে এই মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালকে আটকাতে গেলেন, কেন এটা আপনি করতে গেলেন।

(আমার মাথা পরিষ্কার হচ্ছে। আমি বুঝছি ঘটনা আসলে কী ঘটেছে।) আসলে আমাদের জীবনের মানে কী। যদি আমরা দেশের জন্যে দশের জন্যে নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পারি, তাহলেই আমাদের জন্মগ্রহণ করা সার্থক। আর তাই...

আচ্ছা ঘটনাটা ঘটল কী করে? একটু সবিস্তারে বলবেন?

(মাথা খারাপ। আমি যে বিড়াল মারতে গিয়ে একজন টপ টেররকে মেরে বসে আছি, সেটা কি আর আমি বলতে পারি)

আসলে রোজ ভোরবেলা ওঠা আমার অভ্যাস। আজও আমি খুব ভোরে মানে রাত থাকতে থাকতেই উঠে পড়ি। কারণ আজকে আমাকে একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্যে যেতে হবে। কিছু পড়াশোনা করা দরকার। উঠে আমি একটু যোগ ব্যায়াম করতে ছাদে যাই।

তখন দেখি ছাদের সিঁড়ি থেকে একজন লোক নেমে আসছে। আমি

তাকে বলি, আপনি কে? কী চান? আমার মনে হচ্ছিল, লোকটার চেহারা যেন কোথায় দেখেছি। উনি আমাকে বলেন, আমার নাম শোনার দরকার নাই। কারণ আমার নাম শুনলে তোমার কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। আমার তখন মনে পড়ে এই হচ্ছে টপ টেরর কাশেম। আমার হাতে একটা ক্রিকেট ব্যাট ছিল। এটা আমার ব্যায়ামের একটা উপকরণ। আমি রোজ ভোরবেলা ব্যাট হাতে ধরে একশবার ওঠবস করি। আমি তখন তার মাথা বরাবর ব্যাটটা চালিয়ে দেই। ছক্কা হয়ে যায়।

আচ্ছা আপনি যে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন সেটা দিয়ে আপনি কী করবেন?

আমি বলি, এত টাকা তো আমি জীবনে একসঙ্গে দেখি নাই। আমি একবার টাকাটা গুনে দেখব।

টিভি-সাংবাদিকেরা আমার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে যান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিভিশনে আমার ছবি আমার কথা প্রচারিত হতে শুরু হয়। পরের দিনের সংবাদপত্রে আমার ছবি ছাপা হয়। উফ। সারাক্ষণ আমাকে একই গল্প বলতে হয়।

অনেক সাংবাদিক ভাঙা টেলিভিশনের ছবি তুলে নিয়ে যান। টেলিভিশনটা যে সন্ত্রাসী কাশেইমার সঙ্গে হাতাহাতির সময় ভেঙে গেছে, সেটা তারা নিপুণভাবে বর্ণনা করেন।

সীমার মুখে আবারও হাসি ফুটে উঠেছে। সে বলে, যাক বাবা, তাহলে তোমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়নি।

কল্লোল বলে, সেটা তো তুমি আগে থেকেই জানো।

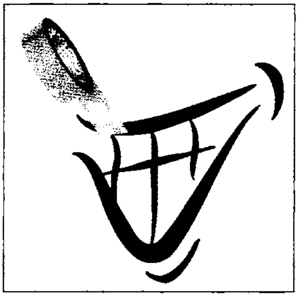

তারপরের ঘটনা আমি বলি–সীমা বলে।

বলো কল্লোল সম্মতি দেয়।

সীমা বলে, আমি টিভির খবরে দেখি তোমাকে দেখাচ্ছে। তোমার মামার বাসাটা তো আমাদের বাসার সামনেই। ওখানে সারাক্ষণই সাংবাদিকদের গাড়ি, টেলিভিশনের ক্যামেরা ভিড় করে আছে। আমি বলি, আশ্চর্য তো। আমাদের সামনের বাসায় এত কাণ্ড ঘটে গেল আর আমি জানি না। আমার কৌতূহল হয়। আমি টেলিভিশনের খবরে তোমাকে দেখি। ছেলেটাকে আমার পছন্দ হয়। লম্বা চওড়া আছে।

তারপর একদিন দেখি, তুমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে ৫ লক্ষ টাকার চেক নিচ্ছ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তোমার মতো সাহসী মানুষ আমাদের অনেক দরকার।

আমি বলি, আমারও অনেক দরকার।

আমার বাসার সামনের বাসায় এই রকম একজন রীতিমতো তারকাখ্যাতিওয়ালা মানুষ থাকে, অথচ আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করব না? একটা অটোগ্রাফ, একটা ফটোগ্রাফ তো সংগ্রহে রাখা দরকার।

আমি উসখুস করি। কী করে তোমার সঙ্গে দেখা করা যায়, সেই তক্কে তক্কে থাকি।

তারপর তোমার মামার বাসায় গিয়ে হাজির হই। ডোরবেল বাজাই। আমার বুক কাঁপে। ভয় ভয় লাগে। তোমার মামা দরজা খোলেন। আমি তাকে সালাম দিই।

তাকে বলি, আংকেল কেমন আছেন।

তিনি বলেন, ভালো আছি মা।

আমি নিজের পরিচয় দিই। তাকে জানাই আমি সামনের বাসায় থাকি। হাসনাত সাহেবের মেয়ে।

ও তুমি হাসনাত সাহেবের মেয়ে। তাই বলো। আসো ভেতরে আসো।

আমি বলি, আপনাদের বাসায় একজন যে হিরো থাকেন, তাকে দেখতে এসেছি।

মামা সুন্দর হাসেন। হ্যাঁ। ও তো নিজেও বিখ্যাত হয়ে গেছে। আমাদেরকেও বিখ্যাত বানিয়ে ফেলেছে। আসো আসো।

আমি ভেতরে যাই। ড্রয়িং রুমে বসি। মামা ভেতরে যান। বলে যান, তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি অপেক্ষা করি। তোমার জন্য।

তারপর তুমি আসো। তোমাকে দেখেই আমার ভালো লাগে। চোখে মুখে সারল্য। বোঝা যাচ্ছে, শহরের কৃত্রিমতা এখনও তোমাকে স্পর্শ করেনি।

কল্লোল বলে, আর তোমাকে দেখে আমার কলজে লাফ দিয়ে ওঠে। মানুষ এত সুন্দর হয়! আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

সীমা বলে, আমি প্রথম কথা বলি। তুমি তো কথাই বলছিলে না। আমি বলি, আমার নাম সীমা। আমি সামনের বাসায় থাকি। আপনার অটোগ্রাফ নিতে এসেছি।

তুমিও বাধ্য ছেলের মতো বলো, ফটোগ্রাফ নিবেন। নেন।

আমি বলি, অটোগ্রাফ নিতেই এসেছিলাম। ফটোগ্রাফ পেলে তো কথাই নাই। আংকেল আমাদের একটা ফটো তুলে দেন না।

আমি মোবাইল ফোনটা তোমার মামাকে দিই। তিনি আমাদের ফটো তুলে দেবেন। আমরা পাশাপাশি দাঁড়াই।

কল্লোল বলে, তোমার পাশে দাঁড়াতে গিয়ে তোমার শরীরের ছোঁয়া পেয়ে যাই। আমার বুকে ঝড় ওঠে। আমি নিজেকে সামলে নিই।

সখিনা ট্রলি ঠেলে চা মিষ্টি আনে। আমি নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে তোমাকে মিষ্টি তুলে দিই। বলি, নিন, নিন, মিষ্টি নিন।

তুমি মিষ্টি হাতে নিয়ে চামচে নাড়ো কিন্তু খাও না। মামা ভেতরে চলে যান।

ঘরে শুধু তুমি আর আমি।

সীমা বলে, আমি ভাবি, ভদ্রলোকের মোবাইল ফোনের নম্বরটা কী করে আদায় করা যায়!

আমি একটা বুদ্ধি বের করি। আমার মোবাইল ফোনটা আমার ব্যাগের ভেতরে রেখে ভাব করি যে ওটা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাকে বলি, ভাইয়া

আমার মোবাইলটা কই রাখলাম। খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার মোবাইলটা থেকে একটা কল দেন না?

তুমি তোমার মোবাইল ফোনটা এগিয়ে দাও। আমি তাতে নিজের নম্বরটা লিখে কল দিই। আমার নিজের ব্যাগেই মোবাইল বাজে।

আমি নিপুণ অভিনেত্রীর মতো বলি, থ্যাংক গড। পেয়েছি। আমার ব্যাগেই ছিল।

তুমি বলো, আপনি তো খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। আমার এখানে এসে যদি আপনার মোবাইল ফোন হারিয়ে যেত, সে ভারি লজ্জার ব্যাপার হতো।

আমি বলি, আপনার নাম্বারটা সেভ করলাম। আমার নাম্বারটাও আপনি রাখতে পারেন। সীমা নাম।

তুমি বলো, আচ্ছা আচ্ছা। তাই তো। আপনার নাম্বারটা তো আমি সেভ করতে পারি। ঠিক আছে করি।

আমি বলি, আজকে আসি।

তুমি বলো, আচ্ছা।

আমি বলি, কী লোক। বলতে পারত না, আরে না, আরেকটু থাকেন। বললই না। বলে কিনা, আচ্ছা।

কল্লোল বলে, আরে আমার শরম লাগে না। আমি প্রথম দিনেই তোমাকে বলব যে তুমি আরেকটু থাকো।

আচ্ছা তারপর কী হলো, আমিই বলি।

সীমা মাথা নাড়ে, আচ্ছা বলো।

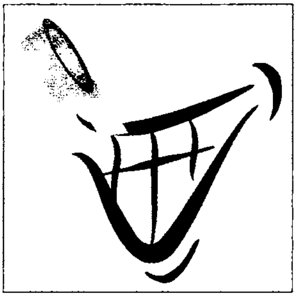

কল্লোল বলে চলে, আমার গুরুত্ব হঠাৎই বেড়ে যায়। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটি। পাড়ার মাস্তানরা আমাকে দেখে সালাম দেয়। মুদি দোকানি ১০০০ টাকার নোটের ভাংতি চাওয়া মাত্রই দিয়ে দেয়। আর ওই চাকরিটাও আমার হয়ে যায়। কারণ কাজি ইমদাদুল হক কল্লোল যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে, সেখানে কোনো মাস্তান চাঁদাবাজ কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আমার বেতনও ধার্য হয় আমার কল্পনাতীত। এমনকি আমার মামিও আমাকে আপন করে নেন।

তিনি আমার কাছে আসেন। বলেন, বাবা কল্লোল তুমি আমার কাছেই থাকবে। আমার ছেলেমেয়ে দুটোই বিদেশে থাকে। এই বাসায় আমি একা থাকি। আমার তো সারাটা দিন কাটতে চায় না বাবা। তুমি বাসায় আছো। এখন একটু গল্প করার লোক পেলাম। একটু তোমাকে ভালোমন্দ রান্না করে খাওয়াতে পারছি, তাতেই আনন্দ। তপুও তো ফোন করে বলেছে, কল্লোলকে বলো যেন তোমার সাথে থাকে।

তবে মামি আমাকে কিছু জরুরি পরামর্শও দেন। যেমন সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া যে বহু রোগ থেকে মুক্ত থাকার উপায়, সেটা আমি মামির কাছ থেকেই শিখি। আসলে মানুষের হাত থেকেই বহু জীবাণু ছড়ায়। হাতই আমরা চোখে দিই। হাতই আমরা মুখে দিই। হাত দিয়ে আমরা পরস্পরের সাথে মিশি। ফলে হাত যদি জীবাণুমুক্ত থাকে, তাহলে বহু রোগশোক থেকে আমরা বাঁচতে পারব।

একদিন তপু ভাইয়ার সাথে আমার কথা হয়। উনি টেলিফোন করেন। বলেন, কল্লোল, তুমি এসেছ। খুব ভালো করেছ। শোনো। জানো তোমার একটা অসুস্থতা আছে। এটা একটা মানসিক রোগ।

এটা তোমার হয়েছে নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে। আমরা দুই ভাইবোনই বিদেশে চলে এসেছি। বাবাও তার চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মা

একলা থাকেন। তার মনে হয়, তিনি যদি মরে পড়ে থাকেন, কে তাকে দেখবে। কাজের মেয়েটা যদি তাকে মেরে ফেলে রাখে, তাহলেই বা কে টের পাবে। এখান থেকে তার অত্যধিক পরিচ্ছন্নতার বাতিকটা দেখা দেয়। আমেরিকায় এই রোগ খুব সাধারণ। এটাকে বলায় ওসিডি। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডারস। এই রোগের লক্ষণ যাদের আছে, তারা সব সময় সন্দেহ করতে থাকে, এই বুঝি চুলাটা বন্ধ করা হয়নি। ঘর থেকে বেরিয়ে মনে হয়, আমি কি ঘরে তালা দিয়েছি। আবার ফিরে যায়। গিয়ে দেখে তালা ঠিকই দেয়া হয়েছে। তারা ঘরে কোনো বাইরের লোক এলে সেই ঘরটা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে। অনেক সময় হাতে দস্তানা পরে তারপরে বাইরে যায়।

আমেরিকায় প্রতি দশ হাজার মানুষের একজনের এই রোগ আছে।

মার বেলাতেও এই রোগটা তীব্র হতে পারে। যদিও এটা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে। তোমার সাফল্য মাকে কিছুটা আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। তোমাকে মা পছন্দ করতে শুরু করেছে। এ থেকে আমরা বুঝছি উনি এখন ভালো হওয়ার পথে। তুমি যদি আরো কিছুদিন তার সঙ্গে থাকো, তার সঙ্গে গল্পগুজব করো, তাহলে তিনি পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আমার জন্যে এই প্রস্তাব সব দিক থেকেই ভালো প্রস্তাব। কারণ কেবল চাকরি শুরু করেছি। প্রথমেই কোথায় বাসা পাব। কোথায় উঠব। আর তা ছাড়া তোমার বাসার সামনে আমি থাকি, এটাই বা কম কী! আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি, সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ, তাহার গাছে গায় যে দোয়েল পাখি তাহার গানে আমার নাচে বুক।

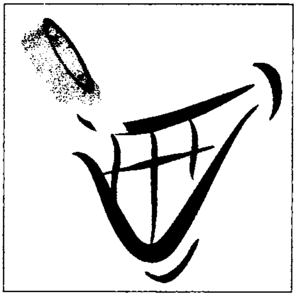

সীমা বলে, আমি তোমাকে ফোন করি। তুমি ফোন ধরো।

হ্যালো, কেমন আছেন? তুমি বলো।

আমি বলি, বলেন তো আমি কে?

'তুমি সীমা।'

'কী করে বুঝলেন?'

'ওমা। আমি তোমার নম্বর সেভ করে রাখলাম না?'

' রেখেছেন তাহলে। আচ্ছা ভালো করেছেন। রেখেছেনই যদি আপনি আমাকে ফোন করেননি কেন?'

'ফোন করতে ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু করিনি।'

'কেন? করেননি কেন?'

'ভাবলাম, ঢাকা শহরের মেয়ে। হঠাৎ করে ফোন করব। কে ধরবে না ধরবে। কী মনে করবে না মনে করবে।'

'কী মনে করব। আমি আপনার ফোন নম্বরটা নিয়ে আপনাকেও ফোন নম্বরটা দিয়ে এসেছিলাম কেন?'

'কেন?'

'যাতে আপনি আমাকে ফোন করেন।'

'আমি ভাবলাম আপনি যখন ফোন নম্বর নিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমাকে ফোন দেবেন। আমি সারাক্ষণই আমার ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকি। এই বুঝি কল আসে। কই। আসেই না।'

'আচ্ছা শোনেন। আপনি আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলছেন কেন?'

'কী বলব?'

'তুমি করে বলবেন।'

'আপনি কিছু মনে করবেন না তো?'

'আমি। আমি কী মনে করব? আমিই তো আপনাকে বললাম তুমি করে বলতে।'

'আচ্ছা বলব।'

'বলেন।'

'কী বলব?'

'তুমি করে?'

'আচ্ছা তোমাকে তুমি করেই বলব। কেমন আছ?'

'এখন খুব ভালো আছি। একটু আগেও ভালো ছিলাম না।'

'কেন একটু আগে ভালো ছিলে না কেন?'

'কারণ একটু আগে পর্যন্ত আপনি আমার কোনো খোঁজ খবর নেননি। আমাকে ফোন করেননি। আমাকে আপনি আপনি করে সম্বোধন করেছেন। এখন আপনি তুমি করে বলছেন। খুব আপন আপন লাগছে।'

'তাহলে তুমিও আমাকে তুমি করে বলো।'

'ওমা বলে কী! আপনি আমার চেয়ে কত বড়। আপনাকে আমি কেন তুমি করে বলব?'

'তা অবশ্য ঠিক। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বোলো না।'

জলাভূমির ধারে, বটগাছটার বাঁধানো শানে পা ঝুলিয়ে বসে তারা দুজনেই হেসে ওঠে। সীমা বলে, আচ্ছা আমি বললাম কেন তোমাকে তুমি করে বলব, আর সাথে সাথে তুমি তা মেনে নিলা। তুমি এই রকম কেন?

কল্লোল বলে, আরে আমি কী করে বুঝব, মেয়েদের মনের কথা আর মুখের কথা এক নয়। আমি তো মফস্বল শহর থেকে আসা সহজ-সরল একটা ছেলে, তাই না।

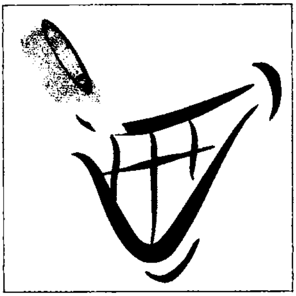

দুজনেরই মনে পড়ে যায় এরপরের দিনগুলোর কথা। থর থর আবেগে কাঁপা ছিল সেইসব দিনরাত্রি।

সীমা ফোন করে কল্লোলকে।

কল্লোল অপেক্ষা করে থাকে সারা দিন সারা রাত, সীমার ফোনের জন্যে।

সীমার ফোন এলেই সে আড়াল খোঁজে। সেটা অফিসেই হোক, কিংবা মামার বাসাতেই হোক।

কত যে কথা দুজনে বলে। অর্থহীন কথা। অপ্রয়োজনীয় কথা।

'এই খেয়েছেন?'

'না খাইনি। তুমি খেয়েছ?'

'না।'

'কেন?'

'আপনি খেলে তারপর খাব।'

'আচ্ছা আসো একসাথে খাই।'

'আচ্ছা আসেন।'

'যাও তুমি খাবার টেবিলে বসো।'

'আপনিও খাবার বের করেন। কী এনেছেন। রুটি আর আলুভাজি?'

'না। খিচুড়ি। আর ডিম অমলেট।'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে না?'

'হয়েছে। তবে গরম করে নেওয়া যাবে। অফিসে মাইক্রো ওভেন আছে।'

'আচ্ছা নেন তাহলে।'

'আর তোমার কী অবস্থা? তুমি কী খাচ্ছ?'

'মা তো খাবার টেবিলে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া পছন্দ করবেন না।

আচ্ছা একটা কাজ করো। খাবার টেবিলে তোমার ফোনে কথা বলার দরকার নাই। তুমি কী খাচ্ছ সেটা বলে বাই বলো।'

'আমি আর কী খাব। সেই ভাত, সেই পটল ভাজা, মুরগির ঝোল। আচ্ছা রাখি। এক সাথে খাব। আপনি খাবার গরম করে নেন। নিয়েই আমাকে একটা মিসকল দেবেন। তখনই আমি খাওয়া শুরু করব।'

এই রকম অর্থহীন কথাবার্তা চলে দুজনের। তারা এক সাথে খায়। একসাথেই ঘুমুতে যায়। দুইজন দুই বাড়িতে। তাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব যথেষ্ট। কিন্তু কাজগুলো তারা একসঙ্গেই করে।

মোবাইল ফোন মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা সহজ আর অভিনব করে ফেলেছে।

অবশ্য মিথ্যা কথাও মোবাইলেই বেশি হয়।

এই তুমি কী করো?

এই তো। তোমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

খেয়েছ?

না খাইনি। তোমার সাথে খাব না?

(আসলে কিন্তু সে খেয়ে নিয়েছে আগে ভাগেই)

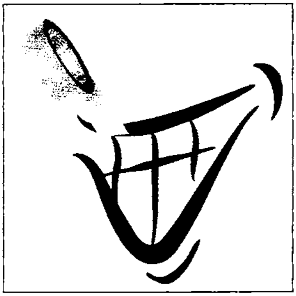

তো এর মধ্যে কেবল কথা বললে তো চলে না। তাদের নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও করার ইচ্ছা জাগে।

'এই আপনি কী করছেন? একটু ছাদে আসেন না?'

'ছাদে। এখন। আচ্ছা আসছি।' কল্লোল ছাদে চলে যায়।

ততক্ষণে সীমাও তাদের বাড়ির ছাদে চলে গেছে। তারা হাসি বিনিময় করে। হাত নাড়ে। সীমা ফুল ছুড়ে মারে কল্লোলের ছাদে। সেটা গন্তব্যে পৌঁছয় না। দুই বাড়ির মধ্যে নোম্যানস ল্যান্ডে পতিত হয়।

কল্লোল বলে, চলো আজকে ছবি দেখতে যাই।

সীমা বলে, আচ্ছা চলেন।

তারা সিনেমা হলে গিয়ে মিলিত হয়। পাশাপাশি সিটে বসে।

সীমা ডিগ্রি পড়ছে। কলেজে যাওয়ার নাম করে তাদের বেরুতে হয়। কল্লোল অফিস থেকে বের হয় জরুরি পারিবারিক কাজের কথা বলে।

তারা পাশাপাশি বসে।

পরস্পরের হাতে হাত রাখে।

তারা ছবি দেখা শেষ করে একসঙ্গে বসে দোসা খায়।

তারপর একদিন কল্লোল বলে, আমাকে কি তোমার এখনও বুড়া বলেই মনে হচ্ছে?

মানে?

মানে হলো, তুমি বলেছিলে, আমি অনেক বুড়া তাই আমাকে তুমি বলা যায় না। এই কদিনে কি আমার বয়স একটুও কমেনি?

সীমা বলে, কমেছে।

তাহলে এখন কি তুমি আমাকে তুমি বলতে পারো।

পারি।

বলো তো।

কী বলব।

বলো যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি এই ধরনের খ্যাত কথা বলতে পারব না।

আচ্ছা তাহলে বলো, আমি তোমাকে ভালোবাসি না।

এই ধরনের মিথ্যা কথাও আমি বলতে পারব না।

তাহলে তুমি কি বলতে পারবা?

বলতে পারব যে তুমি একটা গাধা।

কী? আমি গাধা?

অবশ্যই।

আর তুমি কী?

আমি হলাম গাধী। তুমি গাধা আমি গাধী। তুমি আধা আমি আধি। কী খুশি?

হুঁ।

কেন? খুশি কেন?

কারণ তুমি আমাকে তুমি বলেছ।

এই তো আমার গাধা সব বুঝেছে।

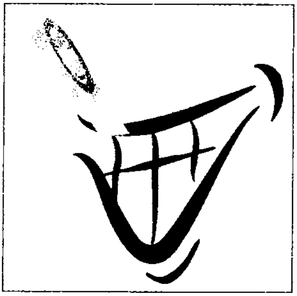

এবং অতঃপর সীমাদের বাসায় কথা ওঠে। এই রকম একটা গুণ্ডা বদমাস মাস্তান ছেলের সঙ্গে সীমা নাকি গোপনে দেখা করে? সিনেমা থিয়েটার দেখে? ফোনে কথা বলে। ওকে নিবৃত্ত করো।

ওরা বলে, সীমা কথা কি ঠিক?

সীমা বলে, হ্যাঁ ঠিক।

তুই কি জানিস ও একটা গুণ্ডা?

না তো। জানি না তো।

জানিস ও কত বড় মাস্তান?

না তাও তো জানি না।

না জেনে এইসব ছেলের সাথে মিশিস কেন?

না মিশলে জানব কী করে। আমি তার সাথে কথা বলে দেখেছি খুবই সহজ সরল ছেলে একটা।

ওই রকমই মনে হয়। সহজ সরল ছেলের ভাব ধরে থাকে। আসলে তো মাস্তানের মাস্তান। নাহলে কেউ টপ টেররকে ধরিয়ে দেওয়ার সাহস রাখে।

তা অবশ্য ঠিক।

তাহলে তুই এই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দে।

আচ্ছা। দেখি। তোমরাও একটু খোঁজ-খবর করে দেখো। গুণ্ডাপাণ্ডা হলে তার সাথে তো আর সম্পর্ক রাখব না। তাই না?

এইসব কথাবার্তা সীমার হয় বড় আপার সঙ্গে।

বড় আপা চলে গেলে সীমা বাথরুমে ঢোকে। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। সে এখন মন খুলে কাঁদবে।

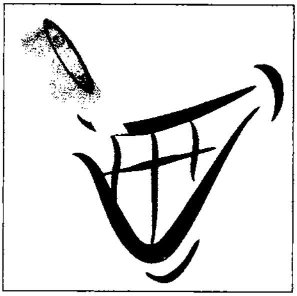

বটগাছের বাঁধানো বেদিতে বসে থাকে দুজন। আজ তারা অনেকক্ষণ গল্প করেছে। এরই মধ্যে তারা খেয়ে নিয়েছে সীমার ব্যাগে করে আনা স্যান্ডউইচ।

কল্লোল বলে, সব তো শুনলা। আমি আসলে বীর না। হঠাৎ করে বীর হয়ে গেছি। আমাকে কি তুমি এখনই ছেড়ে চলে যাবা?

সীমা বলে, তুমি বীর না হলেও তোমার একটা গুণ আছে। তোমার সেন্স অফ হিউমার। ভালো গল্প বলতে পারো।

আর একটা সমস্যার সমাধানও তুমি আজকে করে দিলে। আমার বাসা থেকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। তারা ভাবছিল, তুমি একটা গুণ্ডা। মাস্তান। এই রকম একটা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে কোনো গার্জিয়ানই চায় না। তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে প্রধান দেয়াল হতো তোমার ওই মাস্তান হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যাওয়াটাই। জেনে খুব খুশি হলাম যে তুমি মাস্তান না।

তাহলে তোমার আমার বিয়েটা সম্ভব।'

আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আসলেই দুইজনে মিলে অনেক ফোনের বিল তোলা হয়েছে। আর তুমি চাকরিটাও তো ভালোই পেয়েছ।

তাহলে চলো বিয়ে করে ফেলি।

আচ্ছা তুমি তোমার বাসায় বলো ফরমালি প্রপোজাল পাঠাতে। তাহলে নিশ্চয়ই বাসা থেকে না করতে পারবে না।

এই সময় হঠাৎ করেই ফুল বিক্রেতা বালিকাটা উদিত হয়। সে বলে, কইছিলাম কিনা, আপনাগো বিয়া হয় নাই। বিয়ার পরে কেউ এইহানে আসে না। সকলে আহে বিয়ার আগেই। আপনাগো বিয়া হইয়া গেলে আপনেরাও আর আইতেন না।

এই। ঠিকই আসব। দেখিস। বিয়ের পরেও আসব।

আচ্ছা। আইয়েন। বিনা পয়সায় ফুলের মালা দিমু নে।

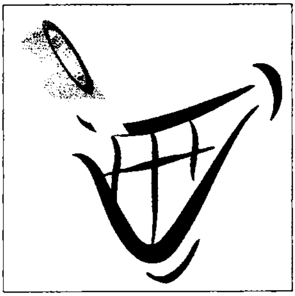

কল্লোল মামির কাছেই কথাটা পাড়ে। মামি, আমার তো মা বেঁচে নাই। আপনারাই এখন আমার গার্জিয়ান। সীমা মেয়েটাকে তো দেখেছেন। ওকে তো আমার খুবই পছন্দ। মেয়েটাও মনে হচ্ছে আমাকে খুবই পছন্দই করে। ওর বাসাতে কি প্রস্তাব দিয়ে কি একটু দেখা যায়?

মামি বলেন, নিশ্চয়ই যায়। ভালো মেয়ে। মনে মনে আমিও ঠিক করে রেখেছি, ওই মেয়েটার সাথে বিয়ে হলেই তোমার সবচেয়ে ভালো হয়। আমারও বাড়ির সামনে ওর বাড়ি। সব কাছাকাছি হওয়াই ভালো।

কল্লোল বলে, থ্যাংক ইউ মামি।

মামি কল্লোলকে হাসি মুখে এই কথা বলেন বটে। কিন্তু তার মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। নিজের ছেলেমেয়ে দুটো দূরে থাকে। এই ভাগ্নেটাকে পেয়ে তার শূন্য ঘরদোর অনেকটাই পূর্ণ ও মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এও এখন বিয়ের কথা বলছে। বিয়ের পরে তারা কি আর এই বাসায় থাকবে?

তিনি নিজের ছেলেমেয়েকেই বেঁধে রাখতে পারেননি। অন্যের ছেলেকে কীভাবে রাখবেন?

পৃথিবীর নিয়মই এই। এটা তো তাকে মেনে নিতেই হবে।

রাতেরবেলা শওকত সাহেবের সঙ্গে তিনি এই নিয়েই কথা বলেন। শওকত সাহেবও তাকে বোঝান, কল্লোল যদি এই বাসায় থাকতে চায়ও, তবু আমাদের উচিৎ হবে তাকে আলাদা সংসার করতে দেওয়া। সব মেয়েরই জীবনে একটা শখ থাকে। তারা স্বামীকে নিয়ে স্বাধীন একটা নীড় বাধতে চায়। আলাদা থাকা মানেই স্বাস্থ্যকরভাবে সুন্দরভাবে থাকা। তাহলেই সম্পর্কটা ভালো থাকবে।

মামি একদিন বলেন, কল্লোল বাবা, বিয়ের পরে এই বাসাতেই কিন্তু তোমরা থাকতে পারো। আমার কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না।

কল্লোল বলে, মামি। আমি তো একটা বাসা দেখে ফেলেছি। ইনফ্যাক্ট সীমারও বাসাটা খুবই পছন্দ হয়েছে। এবার যে আমাকে নিজের বাসায় উঠতেই হয়।

মামি চোখের জল সামলে বলেন,নিজের ছেলেমেয়ে দুইটা বিদেশে। তোকেই নিজের ছেলে হিসাবে পেয়েছিলাম। তুইও চলে যাবি। যাহ। বিয়ের বাসরটা এই বাসাতেই হোক।

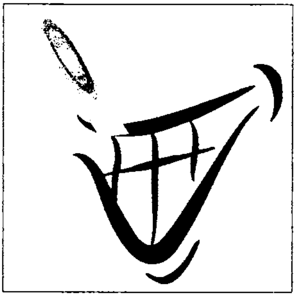

মামা আর মামি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন সীমাদের বাড়িতে।

সীমার পরিবারের পক্ষ থেকে কল্লোলের পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা এরই মধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে।

তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, কল্লোলের মতো ভালো ছেলে আর হয় না। সে আগাগোড়াই শান্ত, পড়ুয়া টাইপ একটা ভালো ছেলে। মা মরা ছেলে। দুঃখে কষ্টে মানুষ। তবে এখন ভালো চাকরিবাকরি করে। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে এই ধরনের ছেলেই ভালো।

কাজেই শুভক্ষণ দেখে সীমা আর কল্লোলের বিয়ে হয়ে যায়। মামির অনুরোধটা তারা রেখেছে। তাদের বাসরঘরটা এই বাড়িতেই সাজানো হয়। বাসরঘর সাজানোর জন্যে আর্ট কলেজ থেকে সীমার তিনজন বন্ধু এসে কল্লোলের মামার বাড়ির একটা ঘরে তিনদিন তিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তারা পুরো ঘরটা ফুল দিয়ে ঢেকে দেয়।

সীমা ঘরে ঢুকে মুগ্ধ। তার বন্ধুরাই সাজিয়েছে, কিন্তু ওরা তাকে সারপ্রাইজ দেবে বলে কীভাবে সাজিয়েছে সেটা বলেনি।

বিয়ের রাতেই বিড়াল মারতে হয়।

বাসর ঘরের দরজা বন্ধ হতে না হতেই কোথা থেকে একটা বিড়াল ডেকে ওঠে মিউ মিউ বলে।

সীমা বলে, ঘটনা কী?

কল্লোল বলে, তাই তো বিড়াল ডাকে কোথায়। ওকে তো মারতেই হবে। প্রথম রাতেই তো বিড়াল মারতে হয়।

সীমা বলে, এই আমিও কিন্তু বিড়াল ভয় পাই। সে কল্লোলকে জড়িয়ে ধরে।

কল্লোল বলে, ছাড়ো ছাড়ো। বিড়াল মারতে হবে না।

সীমা বলে, না আমি তোমাকে ছাড়ব না।

কল্লোল বলে, বিড়াল মারব না?

সীমা বলে, না না বিড়ালটাকে বের করে দাও।

কল্লোল তখন তার হাতের রিমোটটা নিয়ে সিডি প্লেয়ারটা অফ করে দেয়।

সীমা বলে, এর মানে কী?

কল্লোল বলে, বিড়ালের মিউ মিউ সিডিতে রেকর্ড করা ছিল। সেটাই বাজছিল।

সীমা বালিশ দিয়ে কল্লোলের মাথায় বাড়ি মেরে বলে, প্রথম রাতেই বিড়াল মারতে হয়।

কল্লোল বলে, এই শাড়ি কোনটা জানো তো?

কোনটা?

কল্লোল বলে, ওই যে কমোডের মধ্যে যে শাড়িটা আমি ফেলে দিয়েছিলাম, সেটা।

অ্যাঁ কী বলে? সীমা তাড়াতাড়ি শাড়িটা খুলে ফেলে।

কল্লোল হাসতে থাকে, পাগলি, এই শাড়ি তুমি আর আমি মিলে মার্কেটে গিয়ে এক সঙ্গে কিনলাম না? হা হা হা। দেখো কে বিড়াল মারল প্রথম রাতে। হা হা হা।

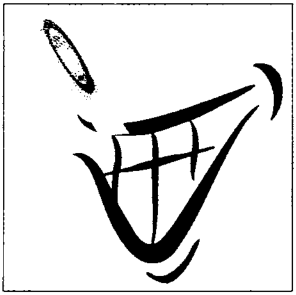

নতুন সংসার। সবকিছু নতুন করে নিজেদের মতো করে সাজাচ্ছে দুজন। কল্লোল আর সীমা। থালাবাসন, আসবাব, শতরঞ্চি, কুশন, কুশনকভার। গ্যাসের চুলা। ঘুরে ঘুরে সব কিনতে ওদের ভালো লাগে।

ওরা ভালোই আছে। খালি একটাই সমস্যা। কাজের বুয়া পাওয়া যাচ্ছে না।

ফলে প্রতি রাতে তারা শুধু দাওয়াত খোঁজে।

রোজ রাতে কি আর দাওয়াত পাওয়া যায়। কাজেই রাতের খাবারটা তারা হয় সীমার বাপের বাড়িতে, নয়তো কল্লোলের মায়ের বাড়িতেই সারে।

সীমার মাও অপেক্ষা করেন, কখন সীমা আসবে।

কল্লোলের মামিও অপেক্ষা করেন কখন ভাগ্নে ও ভাগ্নেবউ এসে হাজির হবে।

ওরা আবার রোজ আসতে লজ্জা পায়। তখন কোনো রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেয়।

যে রাতে সীমা আর কল্লোল আসে না, সে রাতে সীমার বাবা-মারও যেন রাতটা খালি খালি লাগে।

কল্লোলের মামা-মামিও বার বার বলতে থাকেন, ছেলে-মেয়ে দুটো এল না। কোথায় কী খাচ্ছে না খাচ্ছে।

সীমা ও কল্লোল বুড়োবুড়িদের এই সমস্ত অনুভূতির খোঁজ পায় না।

প্রবীণদের হৃদয়টা তরুণদের জন্যে স্নেহের অনন্ত সুধারসে ভরা। স্নেহ সর্বদাই নিম্নগামী। বড়রা ছোটদের সারাক্ষণই বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায়। ছোটরা সেটা বুঝতে পারে না। তারা যখন বড় হয়, তখন তারা আবার তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে কাতর হয়। সর্বস্ব ত্যাগ করতে চায়।

এটাই জগতের নিয়ম।

জগত চলতে থাকে জগতের নিয়মে।

শুধু একদিন তপুর একটা ই মেইল আসে কল্লোলের কাছে, তপু লিখেছে, কল্লোল, তুমি আমাদের অনেক বড় উপকার করেছিলে। মার মানসিক রোগটা কমে গিয়েছিল। মা একদমই সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু তুমি ওই বাসা ছেড়ে চলে আসার পর মায়ের ওই বাতিকটা আবার বেড়ে যাচ্ছে। মা সারাক্ষণই এখন শুধু হাত ধোন। দিনের মধ্যে পঁচিশ ত্রিশবার হাত ধুয়েও তার মনে হয় পরিষ্কার হয়নি।

তুমি কি মায়ের কাছে আরেকটু ঘন ঘন যেতে পারো? এটা আসলে আমারই কর্তব্য। তুতুল তো আমেরিকান বিয়ে করেছে, সে তো আর দেশে কখনও যাবে না। আমারই যাওয়া উচিত। কিন্তু আমার ভিসার সমস্যা আছে। আমি একবার দেশে গেলে আর ফিরতে পারব না। কাগজটা ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত যেতে পারছি না। প্লিজ তুমিই মাকে তার সন্তানের মতো করে একটু দেখো।

কল্লোলের চোখে জল চলে আসে। তার মা মারা গেছে অতিশৈশবে। মামিই তো তার মা।

কল্লোল ঠিক করেছে, সে মামির কাছে ঘনঘনই যাবে।